আমার সাক্ষ্য

আমার সাক্ষ্য

সৈয়দ আলী আহসান

আমার সাক্ষ্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার সাক্ষ্য

সৈয়দ আলী আহসান

বাড পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

আমার সাক্ষ্য ঃ
সৈয়দ আলী আহসান
প্রকাশক ঃ
এ.বি.এম. সালেহ উদ্‌দীন
বাড পাবলিকেশন্স
১২/১৩ প্যারীদাস রোড,
বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

(সৈয়দ আলী আহসান ট্রাষ্টের পক্ষে)

প্রচ্ছদ ঃ প্রবাল

প্রকাশকাল ঃ
আষাঢ়- ১৪০১, জুন- ১৯৯৪

কম্পিউটার কম্পোজঃ
দি বাড কম্পিউটার্স
৮/১ শ্রিশ দাশ লেন
বাংলাবজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রাকর ঃ
সালমানী মুদ্রণ
৩০/৫, নয়াবাজার, ঢাকা

মূল্য ঃ একশত বিশ টাকা

AMAR SHAKHYA (My Confessons) by Syed Ali Ahsan. Published by A.B.M. Saleh Uddin, Bud Publications on behalf of Syed Ali Ahsan Trust Dhaka, Bangladesh, Price : Tk. One hundredTwenty only, 5 $ Dollar

ISBN ❐ 984-482-015-4

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার প্রথম সন্তান

জীনাতকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিক মন্তব্য

আমার সাহিত্যকর্মের সূত্রপাত চল্লিশের দশকে। এখন নব্বইয়ের দশক চলছে। এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সময়কালে আমি নিজেকে সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন দিকে নিয়োজিত রেখেছিলাম। আমার সাহিত্যকর্মের ধারা অব্যাহত থাকলেও কর্মক্ষেত্রে আমি কোন স্থানে স্থির থাকিনি। প্রথমে কলেজের চাকরি, পরে রেডিওর চাকরি, সেখান থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে, তারপর করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান। সেখান থেকে বাংলা একাডেমীতে এলাম প্রধান কর্মকর্তা হয়ে, তারপরই গেলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে বাংলা বিভাগের প্রফেসর ছিলাম এবং কলা অনুষদের ডীন ছিলাম। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি এবং প্রত্যাবর্তনের পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হই। ১৯৭৫ সালে আবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাই। পরের বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগদান করি। ১৯৭৭ সালে শহীদ জিয়ার মন্ত্রীসভায় যোগদান করি। এক বছরকাল মন্ত্রীসভায় ছিলাম। তারপর খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করি। আমার সর্বশেষ কর্মক্ষেত্র ছিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। পূর্ণভাবে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত আমি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলাম। আমার কর্মজীবনে এভাবে বিচিত্র পালাবদল ঘটেছে। যার ফলে নানাবিধ প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কারণে অনেক বন্ধু পেয়েছি, অনেক শত্রুও পেয়েছি। উভয় দিক রক্ষা করে চলার স্বভাব আমার কখনও ছিল না। আমার সকল সিদ্ধান্ত ছিল সুস্পষ্ট। এর ফলে আমার পক্ষে-বিপক্ষে অনেকে দাঁড়িয়েছে। পক্ষের শক্তিরা পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মে সাধারণতঃ নিশ্চুপ থাকে। কিন্তু বিপক্ষের শক্তিরা সর্বদাই উচ্চকণ্ঠ হয়। আমার বিপক্ষের শক্তিরাও উচ্চকণ্ঠ ছিল এবং আছেও।

আমার কর্মক্ষেত্র যেমন বিচিত্র ছিল তেমনি কর্মক্ষেত্রগুলোর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও ছিল বিচিত্র। চল্লিশের দশকে আমি বৃটিশ-ভারতের নাগরিক। সে সময় পাকিস্তান আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। আমি পাকিস্তান আন্দোলনে পরিপূর্ণ মন নিয়ে যোগ দিয়েছিলাম। পাকিস্তান যখন হল তখন পাকিস্তানের কাছে অনেক কিছু আশা করতে থাকি আমি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পাকিস্তানের কাছে আমি যা আশা করেছিলাম তা পেলাম না। আমি চেয়েছিলাম ভাষার ক্ষেত্রে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সামগ্রিক

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপটে বাঙালীদের অস্তিত্ব যেন স্বীকৃত হয়, কিন্তু তা হয় নি। এর ফলে বায়ান্নতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ঘটে এবং একাত্তরে স্বাধীন এবং স্ব-শাসনের জন্য চূড়ান্ত আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। আমি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং আমার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করবার স্পৃহাকে বাঙময় করেছিলাম। আমি কিন্তু কখনও কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের বিচার-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইনি। যার ফলে কোন রাজনৈতিক দলই আমাকে তাদের নিজস্ব বলে ভাবতে পারেনি, এখনও পারে না। প্রত্যেকেই আমাকে অন্যপক্ষীয় বলে মনে করে। এসব কারণেই আমার রাজনৈতিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে এদিক-ওদিক সমালোচনা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। আমি আমার স্বাতন্ত্র প্রহরায় একাকী নিযুক্ত এবং আমার নিজস্ব বিশ্বাস নিয়ে একাকীই রয়েছি।

আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত সমালোচনা হয়েছে সেসব সমালোচনার আমি কখনও উত্তর দেইনি। এ সম্পর্কে আমার একটি যুক্তি ছিল। আমার যুক্তিটা ছিল ঃ 'অন্যায়কে বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই, কেননা বাধা পেয়ে অন্যায় সর্বদাই প্রবল হয়। সঙ্গত কর্মের দ্বারা অন্যায়কে অতিক্রম করতে হয়। এভাবেই অপশিল্পকে অগ্রাহ্য করবার উপায় হচ্ছে মহৎ শিল্পসৃষ্টির আকাঙ্খায় অগ্রসর হওয়া।' (উচ্চারণ ঃ ২৪) কিন্তু আমার বিরোধী পক্ষ আমার এই বিশ্বাসকে এক প্রকার নির্জীব মৌনতা মনে করে আমাকে বারংবার আঘাত করে চলেছে। এভাবে বারংবার প্রচারণায় মিথ্যাকেও অনেক সময় সত্য বলে ভ্রম হয়। সেই কারণেই সত্যকে সুস্পষ্ট করবার জন্য 'আমার সাক্ষ্য' গ্রন্থটি রচিত হল।

'আমার সাক্ষ্য' গ্রন্থে আমার বিরুদ্ধে প্রচারিত সকল মিথ্যা বক্তব্যের আমি উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিবেচনার জন্য এই গ্রন্থটি রচনা। আমার সম্পর্কিত মিথ্যা ভাষণগুলোর যথার্থতা পরীক্ষার জন্য আমার বক্তব্যের একটি প্রয়োজন ছিল। এ গ্রন্থটি সেসব বক্তব্যেরই একটি সংকলন।

বাড পাবলিকেশন্স-এর তরুণ প্রকাশক এ.বি.এম. সালেহ উদ্‌দীন-এর আগ্রহে বইটি প্রকাশিত হল। আমি সালেহ উদ্‌দীন-এর সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

৬০/১ উত্তর ধানমণ্ডী
ঢাকা-১২০৫
৭.১১.৯২

সৈয়দ আলী আহসান

www.pathagar.com

সূচী

আমি এবং রবীন্দ্রনাথ	১
শৈশব স্মৃতি ঃ ধর্মচিন্তা ও মানবতাবোধ	১১
ধর্মনিরপেক্ষতা এবং আমি	১৮
আইয়ুব খান এবং আমি	২৯
লিপি বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে	৩৯
একুশে ফেব্রুয়ারী	৪৭
আমার বিত্ত	৫৬
আজন্ম মার্কিনী	৬৫
আমাদের সংস্কৃতি	৭৩
আমার জীবনে আমি	৮৩
সাক্ষাতকার ঃ সাম্প্রতিক	৯১
শিক্ষা প্রসঙ্গ	৯৭
সাক্ষাতকারঃ দৈনিক বাংলা	১০২
সাক্ষাতকার ঃ মাসিক 'বই' পত্রিকা	১১১
সাক্ষাতকার ঃ পাক্ষিক পালাবদল	১৩১

www.pathagar.com

আ. আ. ট্রাষ্টের অন্যান্য গ্রন্থ্

সন্দেশ রাসক

চৌর পঞ্চাশিকা

দোহাকোষ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

০ আ. আ. ট্রা ঃ ৪

www.pathagar.com

আমি এবং রবীন্দ্রনাথ

আমি আমার শৈশবে রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিনি। আমার জীবনের সূত্রপাতে যে ধ্বনিগুলো আমার কানে প্রবেশ করত তা কোরআন শরীফের ললিত মধুর ধ্বনি এবং কখনও কখনও ফারসী কাব্য পাঠের ধ্বনি। গ্রামীণ পরিবেশে প্রকৃতির বিচিত্র কল্লোলে ধর্মীয় বিনয়ের পরিমণ্ডলে আমি মানুষ হয়ে উঠেছিলাম। শৈশবের প্রথম পর্যায় কেটেছিল যশোরে এবং একটু বড় হয়ে আগলা পূর্বপাড়ায় মাতৃগৃহে চলে এসেছিলাম। সেখানে প্রকৃতির লীলা বৈচিত্রের মধ্যে বৈষ্ণবদের খঞ্জনি এবং বাউলদের একতারা শুনেছি। আমাদের বাড়ির নিকটেই এক সন্ন্যাসীর আস্তানা ছিল। সেখানে কখনও কখনও সন্ন্যাসীর সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ শুনেছি। শৈশবে আমি স্কুলে কখনও পড়িনি, পড়াশুনা করেছি বাড়িতে, গৃহশিক্ষকের কাছে। বাড়িতে ভাষাশিক্ষার ওপর চাপ ছিল প্রবল—ফারসী, উর্দু, বাংলা এবং ইংরেজী। এই চারটি ভাষারই প্রথম পাঠ আমাকে নিতে হয়েছিল। বাংলার গৃহশিক্ষক যিনি ছিলেন তাঁর মুখে রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলামের নাম শুনেছিলাম। কিন্তু পরিপূর্ণ হৃদয় দিয়ে এ দু'জনের কাব্য গ্রহণ করার মত তখন বয়স আমার হয়নি।

আমার বয়স যখন নয়, তখন ঢাকায় আরমানিটোলা সরকারী স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হই। শহরের স্কুলে এসে নতুন নতুন বৈচিত্র্যের সন্ধান পেলাম। নানা ধরনের ছেলের সঙ্গে জীবনে এই প্রথম পরিচয় ঘটল। রবীন্দ্রনাথের কবিতাকেও এই সময়ই সর্বপ্রথম একটু নতুনভাবে পাঠ করলাম। আমি স্কুল জীবন থেকেই কবিতার অনুসন্ধানী ছিলাম। কবিতার প্রতি আমার মোহমুগ্ধতা পরবর্তী জীবনের জন্য আমাকে প্রস্তুত করেছিল।

আমরা নীচের ক্লাসেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। যে ঘটনাটি বিশেষভাবে মনে আছে তা হ'ল ঃ 'সোনার তরী' কবিতা নিয়ে আলোচনা। তখন আমি ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। টিচার্স ট্রেনিং কলেজের গ্যালারী কক্ষে জুলফিকার আলী সাহেব আমাদের সবাইকে নিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' পড়াবার জন্য। ট্রেনিং কলেজে প্র্যাকটিস টিচিং বলে এক ধরনের পঠন ব্যবস্থা আছে। কলেজে ছাত্রদের সামনে স্কুলের কোন কোন শ্রেণীর ছেলেদের এনে আদর্শ পাঠ দেবার চেষ্টা করা হয় এবং

www.pathagar.com

সেই পঠন পদ্ধতি লক্ষ্য করে কলেজের ছাত্ররা জ্ঞান লাভ করেন। কলেজের গ্যালারী কক্ষটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে লম্বা। কলেজের ছাত্ররা পশ্চিম দিকে মুখ করে বসে। গ্যালারীর সামনে বেশ কিছুটা প্রশস্ত জায়গা। সেখানে উত্তর দক্ষিণ করে সাজানো কতকগুলো বেঞ্চ থাকে। সেখানে স্কুলের ছাত্ররা বসে। শিক্ষক স্কুলের ছাত্রদের সামনে দাঁড়িয়ে পাঠ দিতে থাকেন। আমরা আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে বসার পর জুলফিকার আলী সাহেব 'সোনার তরী' পড়ানো শুরু করলেন। তিনি কবিতাটি প্রথমে পাঠ করলেন। পরে বললেন— এ কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের বর্ষার একটি চিত্র এঁকেছেন। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি নামে, আকাশ মেঘে অন্ধকার হয় এবং ধানকাটা সেরে লোকেরা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার চেষ্টা করে। এই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে একটি জাতির জীবনের আশা, আগ্রহ, দুঃখ এবং কর্মধারা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে এই কবিতাটির চিত্রধর্মীতা। আমরা যারা গ্রামবাংলার রূপ দেখেছি তারা অতি সহজেই বলতে পারি কত আশ্চর্য সজীব এবং সুন্দর এই চিত্রটি। আকাশে প্রচুর মেঘের ঘনঘটা, প্রবল বৃষ্টিপাত হবে আশংকা করা যাচ্ছে। ধানকাটা শেষে নৌকো নিয়ে লোকেরা যাচ্ছে। ধানকাটা শেষে নৌকো নিয়ে লোকেরা ঘরে ফিরবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে। নদী পানিতে টইটম্বুর। এই নদীর পানি বায়ু প্রবাহে বর্ষার উদ্‌ভ্রান্ত রূপের সঙ্গে মিল রেখে উদ্বেলিত হচ্ছে। দৃশ্যটি খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু অসাধারণ দীপ্তিময় এবং প্রাণবন্ত। এরকম কিছু বলে জুলফিকার আলী সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন — 'ছবিটি খুব সুন্দর তাই না?'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'খুব সুন্দর। কিন্তু ছবিটিতে কোন রং নেই।'

জুলফিকার আলী সচকিত হলেন মনে হল, কবিতাটিতে আবার চোখ বুলালেন, শেষে বললেন, বর্ষাকাল, আবার মেঘ জমছে আকাশে, খুব অন্ধকারও হয়ে আসছে। এ সময় তুমি রঙ পাবে কি করে? এ সময় সবই তো প্রায় কালো, কিছু ইতস্তত সাদা থাকে।' তিনি একটু পরে আবার বললেন, 'তাই বলে ভেব না রবীন্দ্রনাথে রং নেই। রবীন্দ্রনাথে লাল রং খুব আছে যেটা তোমরা পছন্দ কর। যেমন ধর— জ্বলিতেছে জল/তরল অনল/গলিয়া পড়িছে/অম্বরতল/দিগ্বধূধূ যেন/ছলছল আঁখি/অশ্রুজলে।' সন্ধ্যাকালে পশ্চিম আকাশে সূর্য যখন ডুবছে তখন নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় আগুন জ্বলছে যেন এবং আগুনের শিখায় আকাশ গলে গলে পড়ছে। এই চিত্রের মধ্যে রঙের একটি অপূর্ব খেলা আছে। আবার দেখ, অন্য একটি কবিতায় তিনি বলছেন— 'জানি না কখন এল নুপুরবিহীন/নিঃশব্দ। দেখি নাই স্বর্ণরেখা/কী লিখিল শেষ লেখা/দিগন্তের

www.pathagar.com

তুলি/আমি যে ছিলাম একা/তাও ছিনু ভুলি/আইল গোধূলি।' এখানে সন্ধ্যাকালে পশ্চিমাকাশে সুবর্ণ রেখার কথা কবি উল্লেখ করেছেন। এভাবে রঙকে বিচিত্র কৌশলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

আমাদের স্কুলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একজন ড্রইং শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত অত্যন্ত দক্ষ শিল্পী। 'সোনার তরী' কবিতাটির কথা তাঁকে একদিন বলতে তিনি ছবি এঁকে দেখিয়ে ছিলেন এবং বলেছিলেন—কবিতাটি আসলে রবীন্দ্রনাথের একটি চিত্রকর্ম। এভাবে আমরা শৈশবেই কবিতাকে চিত্রকলার সঙ্গে সম্পর্কিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং রবীন্দ্রনাথকে আমাদের দেশের এবং প্রাণের অত্যন্ত নিকটের মানুষ বলে ভাবতে শিখেছিলাম। তখনই জেনেছিলাম যে প্রকৃতির মধ্যে কত আশ্চর্য বর্ণবিভা থাকে। আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির কাছে যে ব্রহ্মাণ্ড ধরা পড়ে, পূর্বগগণে তার 'রক্তিম রেখা' এবং তাঁর ললাটে নীল নভতল। সে বয়সে রবীন্দ্রনাথের 'উৎসর্গ' কবিতাগুলো কঠিন ছিল, কিন্তু কঠিন হলেও জুলফিকার আলীর সান্নিধ্যে এসে এই কবিতাগুলোর রসাস্বাদ করতে আমি সক্ষম হয়েছিলাম। যেমন ধরা যাক —

'হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্ব গগণে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
ললাট তোমার নীল নভতল
বিমল আলোকে চির উজ্জ্বল
নীরব আশীষ-সম হিমাচল
তব বরাভয় কর।
সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ
জাহ্নবী তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষপর।'

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিকে এবং জীবনের কলগুঞ্জনকে রবীন্দ্রনাথ যে কত বিচিত্ররূপে প্রভাময় করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে। একটি কবিতা আমার খুব ভাল লাগত তখন, তার কয়েকটি চরণ এখনও মনে আছে —

www.pathagar.com

'আমি যারে ভালবাসি
সে ছিল এই গাঁয়ে
বাঁকাপথের ডাহিন পাশে
ভাঙা ঘাটের বাঁয়ে।
কে জানে এই গ্রাম
কে জানে এর নাম।
ক্ষেতের ধারে মাঠের পরে বনের ঘন ছায়ে
শুধু আমার হৃদয় জানে সে ছিল এই গাঁয়ে।।

আমাদের পাঠ্যপুস্তকে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'রাজর্ষী' থেকে একটি অংশ ছিল। গোবিন্দ মানিক্য নক্ষত্র রায়কে সঙ্গে নিয়ে সম্ভবত ঘোড়ায় চড়ে, একটি বনখণ্ডের মধ্যে এসেছেন। সেখানে উভয় ভ্রাতা একে অন্যকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। এই দৃশ্যের নাটকীয়তা আমাকে এতটা অভিভূত করেছিল যে আমি এক টাকা দিয়ে 'রাজর্ষী' উপন্যাসটি কিনেছিলাম। তখন 'রাজর্ষী'র দাম ছিল এক টাকা। উপন্যাসটির নাটকীয়তা এবং ভাষার শালীনতা সে সময় আমার বিচারে অনবদ্য ছিল। আমাদের সংস্কৃত শিক্ষক দুর্গাবাবু বলতেন যে ভাষা শিখতে হলে এবং ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন বুঝতে হলে 'রাজর্ষী' উপন্যাসটি সকলের পড়া উচিত। ব্যাকরণের প্রতি আমার আগ্রহ ছিল না। আমার আগ্রহ ছিল যুদ্ধের প্রতি, সংঘর্ষের প্রতি এবং নাটকীয় দৃশ্যাবলীর প্রতি। এগুলো আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছিলাম 'রাজর্ষী' উপন্যাসে। আমাদের পাঠ্য সংকলনে যে সমস্ত কবিতা থাকত সেগুলোর তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনেক ভাল লাগত। হেমচন্দ্রের একটি কবিতা পাঠ্য ছিল 'দধিচীর তনুত্যাগ'। কবিতাটির আরম্ভে ছিল, 'আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্ব্বেদ গান'। কবিতাটির ঘটনা আমার একেবারেই ভাল লাগেনি। দেবতাদের বিরুদ্ধে অসুররা সংগ্রাম করছে এবং দেবতারা বুঝতে পারছেন যে, তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু যদি দধিচী মুনি আত্মত্যাগ করেন তাহলে দধিচীর অস্থি দিয়ে শর নির্মাণ করে সে শরের সাহায্যে অসুরকুলকে নিধন করা যাবে। দেবতাদের অনুজ্ঞায় দধিচী তনু ত্যাগ করলেন অর্থাৎ মারা গেলেন এবং দেবতারা তাঁর হাড় দিয়ে তীর ধনুক বানিয়ে অসুরদেরকে হত্যা করল। এ কবিতাটি পড়াতে গিয়ে আমাদের সংস্কৃতের পণ্ডিত দুর্গাবাবু বার বার দু'হাত জড়ো করে কপালে ঠেকাতেন। দুর্গাবাবুর এই ভক্তির জন্য প্রধানত; তাছাড়া কবিতাটিতে মানুষের কোন উপলক্ষ্য নেই জেনে এই কবিতাটি আমার কোনদিনই ভাল লাগত না। আমি প্রশ্ন করতাম, 'দধিচী ত্যাজিলা তনু দেবের

www.pathagar.com

মঙ্গলে' এটা কি রকম কথা হল? মানুষের মঙ্গলের জন্য নয় কিন্তু দেবতাদের মঙ্গলের জন্য, এ ভাবটা আমার ভাল লাগেনি। আর একটি কবিতা আমাদের পাঠ্য ছিল শেখ ফজলল করিমের। কবিতাটির প্রথম লাইন হচ্ছে 'কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর', এই কবিতাটিও তত্ত্বমূলক। তবে তত্ত্বমূলক হলেও এতে একটি গ্রহণযোগ্য বুদ্ধিবাদিতা আছে। আমাদের অন্য একজন শিক্ষক প্রাণবল্লভ বসাক আমাদের গান শেখাতেন। তিনি আলবার্ট লাইব্রেরীর স্বত্ত্বাধিকারী ছিলেন। তিনি সৈয়দ এমদাদ আলীর কথা খুব বলতেন। সৈয়দ এমদাদ আলীর 'ডালি' নামে একটি কবিতা আমাদের পাঠ্য ছিল। এমদাদ আলীর 'সেকেন্দ্রা' কবিতাটি অবশ্য আমার ভাল লাগত। অত্যন্ত সহজে সংক্ষেপে সুস্পষ্টভাবে সম্রাট আকবরের প্রতি প্রশস্তি এই কবিতায় আমরা পাই। এক কথায় বলা যায় স্কুল জীবনেই একটি আগ্রহ এবং আনন্দের সমুচ্চয় হিসেবে কবিতাকে এবং বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকে আমি পেয়েছিলাম। স্কুলে থাকতেই সম্ভবত ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতার সংবাদ পেয়েছিলাম। সে অসুস্থতার সংবাদে আমার এবং আমাদের সহপাঠীদের ব্যাকুলতার অবধি ছিল না। আমরা কয়েকজন মিলে শান্তিনিকেতনে টেলিগ্রামও পাঠিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের কুশল সংবাদের জন্য। আরোগ্য লাভ করে রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন, তার নাম 'প্রান্তিক'। যে কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলেছেন, কথার উপরে কথা আজীবন সাজিয়ে চলেছি, এবার কিন্তু থামাতে হবে। বাক্যের মন্দির চূড়া গেঁথে কত অসাধ্য সাধন করেছি ভাবছি কিন্তু এখন মনে হয় কোন কিছুই করা হয়নি, অকস্মাৎ সব থেমে যাওয়ার আভাষ পেলাম। সে বয়েসেই মনে হত এই বিরাট এবং বিপুল সৌন্দর্য সাধক রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হলে আমাদের কি হবে? তখন আবেগ ছিল প্রচুর, যুক্তি এবং বিবেচনা ততটা প্রবল ছিল না। তাই রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্রকে আমরা কখনও হারাবো এটা ভাবিনি।

ইস্কুল থেকে কলেজ জীবনে এলাম, তখন ১৯৩৮ সাল। আমার জন্য সেটি এক বিরাট পরিবর্তন। একটি নতুন পরিবেশ এল, সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর স্বাধীনতা। রাজনীতির কথাও আমাদের চিন্তায় এল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন আরম্ভ হয়েছে। বড়দের সঙ্গে নানাবিধ আলোচনায় অংশগ্রহণের উৎসুক্য জাগল। সমগ্র দেশে তখন সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নানা রকম বিরোধ রূপলাভ করছে। সে সময় আমরা রবীন্দ্রনাথকে চেয়েছিলাম সকলের উর্ধ্বে অবস্থান করতে। কিন্তু মন ভারাক্রান্ত হল যখন দেখলাম প্রাদেশিক পরিষদে মুসলমানদের সংখ্যা অনুপাতে আসন নির্ধারণের ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হিন্দু

www.pathagar.com

মহাসভার প্রবল প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করলেন। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সম্মিলিত প্রতিবাদ সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করলেন। আমি কিছুতেই হিন্দুদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই পক্ষাবলম্বন মেনে নিতে পারিনি। তবে কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অধিকার আমার মানসিকতায় পূর্ণভাবে সমর্থিত ছিল। তখন অনেক নতুন কবির আবির্ভাব ঘটেছে, রবীন্দ্রনাথের ধারাক্রম থেকে সরে এসে অনেকেই নতুন ভঙ্গিতে কবিতা লিখছেন। এঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বুদ্ধদেব বসু এই দু'জনের নামই আমরা প্রথম শুনি। বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকার সাহায্যে এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র 'নিরুক্ত' পত্রিকার সাহায্যে বাংলা কবিতায় নতুন ভক্তির প্রবর্তনা করে চলেছেন। কোন বছর ঠিক মনে নেই, আমি কলকাতায় এসেছিলাম কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে। সেখানে তখন সর্ব ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের সম্মেলন হচ্ছিল। এই সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটি বিতর্কিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সভাপতি হিসেবে মুলকরাজ আনন্দ একটি বিতর্কের সূত্রপাত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'সময়ের শাসন মেনে আমাদের অগ্রসর হতে হয়। অতীতকে আমরা অস্বীকার করব না, কিন্তু অতীতকে আমরা অনুকরণ করব না। একটি সময়কালের জন্য রবীন্দ্রনাথ কবিতার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সে সময়ের প্রতি আমরা চিরকাল শ্রদ্ধান্বিত থাকব। কিন্তু এখনকার সময়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সময়ের পার্থক্য অনেক। এখন সাহিত্যকর্মের অগ্রযাত্রায় রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করার অর্থ হচ্ছে সমাজ বিমুখতা এবং পশ্চাদমুখিনতা।' এই বিবরণটি 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে বুদ্ধদেব বসু মুলকরাজ আনন্দকে সমর্থন করেছিলেন। এভাবে কলেজের চত্বরে পৌঁছেই লক্ষ্য করলাম যে পুরাতনের বিরুদ্ধে একটি অভিযান আরম্ভ হয়েছে এবং সাহিত্যকর্মে নবীনরা অধিকার এবং প্রতিষ্ঠা কামনা করছেন।

আমাদের বাংলার শিক্ষক ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। তিনি নবীনদের এই পরিবর্তনের আন্দোলনটি সমর্থন করতেন না। তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়াতেন। একেকটি কবিতা পাঠ করে বলতেন, 'এই অনবদ্য বাচনভঙ্গির কি তুলনা আছে? বল, কে একে অতিক্রম করবে? সময় রবীন্দ্রনাথকে বহন করে চলে। তার সময় শেষ হয়নি, আগামীতেও শেষ হবে না। একটি বিস্ময়কর কাল অতিক্রান্ত যৌবন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিরকাল বেঁচে থাকবেন।'

১৯৪০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে প্রবেশ করি। বাংলার শিক্ষক হিসেবে মোহিতলাল মজুমদারকে পেলাম। মোহিতলালের কবিতার

www.pathagar.com

সঙ্গে পরিচিত হলাম এবং তাঁর কবিতার মাধ্যমে একটি নতুন প্রবৃত্তির সঙ্গে পরিচিত হলাম। তাঁর বলিষ্ঠতা, ঔদার্য, নাটকীয় ভঙ্গি এবং তীব্র গতিবেগ আমাকে মুগ্ধ করে। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একজন প্রচণ্ড সমালোচক। তিনি রবীন্দ্রনাথকে একমাত্র রোমান্টিক ভাবাবহের কবি বলে উল্লেখ করতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও ছিল কিন্তু মোহমুগ্ধতা ছিল না। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে দেবতার মত অর্চনা করত তাদেরকে তিনি তিরস্কার করতেন। আবার যেসব নবীন রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করবে তেবে বিকল ভাষায় কথা লিখত তাদেরকে তিনি ব্যঙ্গ করতেন। তিনি বলতেন যে, প্রবল ধ্বংসলীলার মধ্যে দাঁড়িয়েই নতুন নির্মিতির উদযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এই বলেই তিনি তাঁর রচিত 'কালাপাহাড়' কবিতাটিকে আবৃত্তি করতেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদে আমরা সকলেই বিচলিত হয়েছিলাম। তাঁর মৃত্যুর পরের দিন কার্জন হলে বিরাট শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উপাচার্য রমেশ মজুমদার এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন। আমার বন্ধু কবি কিরণশংকর সেনগুপ্ত দীর্ঘ একটি কবিতায় শোকাহত মানসিকতার একটি প্রবল আবেগ প্রকাশ করেছিলেন। আমিও তখন একটি কবিতা রচনা করেছিলাম। কিন্তু কবিতাটি সভায় পাঠ করবার সুযোগ আমি পাইনি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অল ইণ্ডিয়া রেডিও, কলকাতা কেন্দ্র থেকে কয়েকজন কবির অর্ঘ নিবেদন পাঠ করা হয়। এঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন, সজনীকান্ত দাশ ছিলেন। সজনীকান্তের কবিতাটি আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল। সজনীকান্তের কবিতার প্রথম চরণ ছিল—'বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেছে কেউ?' কবিতাটি শুনে আমি অভিভূত হয়েছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম শেষ করে কলকাতায় গেলাম। কলকাতায় একটি নতুন পরিমণ্ডলের মধ্যে নিজেকে যুক্ত করি। বন্ধু হিসেবে যাদেরকে কাছে পেলাম তারা হচ্ছেন ফররুখ আহমদ, কাজী আফসার উদ্দিন আহমদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শওকত ওসমান, আহসান হাবীব। এদের মধ্যে ফররুখ আহমদ আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। ফররুখ আহমদ ছিল অসাধারণ আবেগপ্রবণ, প্রবলভাবে ইসলামের নৈতিকতায় বিশ্বাসী এবং রবীন্দ্র ভাবাদর্শের প্রবল সমালোচক। সে রবীন্দ্রনাথকে সর্বমানবীয় বোধের কবি হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করত। তার বক্তব্য ছিলঃ রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ হিন্দু এবং হিন্দু প্রভাবেই তাঁর যথার্থ সিদ্ধি। যেমন মুসলমান হিসেবে ইকবালের সিদ্ধি। বেদ, উপনিষদের ব্যঞ্জনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সফলকাম এবং তার সফলতাকে সকলেই সম্মান করবে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্বে ফররুখের কোন দ্বিধাবোধ ছিল না। কিন্তু

www.pathagar.com

তাঁর মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বের উৎস ছিল যে বেদ ও উপনিষদ একথা সে বারবার বলত। এ সময় পাকিস্তান আন্দোলন চলছে এবং এ আন্দোলন ফররুখকে অসম্ভব উদ্বেলিত করেছিল। আমরা সময় পেলে 'সওগাত' অফিসে বসতাম অথবা মাসিক 'মোহাম্মদী'র অফিসে বসতাম। সেখানে নানা রকম আলোচনা হত। কখনও কখনও আলোচনার মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ এবং হাবিবুল্লাহ বাহার এসে উপস্থিত হতেন। তাঁরাই তখন আলোচনায় নেতৃত্ব দিতেন। আজ অনেকটা পিছনে দৃষ্টি ফেলে অনুভব করতে পারি যে, আমাদের সকলের কাছে তখন পাকিস্তান ছিল একটি বিরাট আদর্শ —ভৌগলিক বন্ধনীতে আবদ্ধ কোন রাষ্ট্র নয় কিন্তু ইসলামী আদর্শের তাৎপর্যবহ একটি অনুভূতি। এই বিশেষ অনুভূতিটাই আমাদের অনেককে অন্ধ করে ফেলেছিল। আমরা পাকিস্তানকে সকল কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিতে শিখেছিলাম। ফররুখ একটি কবিতা লিখেছিল 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। আমার মনে আছে কবি অজিত দত্ত এই কবিতা পাঠ করে হেসেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'ফররুখ যদি কলকাতা শহরের নিম্নবিত্ত মুসলমানদের বিভিন্ন শ্লোগান এবং 'জারঘন' নিয়ে কবিতায় পরীক্ষা করে তাহলে একটা নতুন কাব্যরূপ গড়ে উঠতে পারে।' এই সময় কলকাতায় এবং ঢাকায় সম্ভাব্য পাকিস্তান পরিকল্পনার কথা চিন্তা করে দু'টি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে উঠেছিল—একটি হল ঃ পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি, আরেকটি হল ঃ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ।' এই উভয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল ঃ আইরিস লিটারেরী রিভাইভালের মত একটি আন্দোলন গড়ে তোলা।' যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য হবে মুসলমানদের অতীত, ইসলামের ভাবাদর্শ এবং গ্রামীণ লোককাহিনীকে অবলম্বন করে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করা। পাকিস্তানের পটভূমিকায় এই আন্দোলন কিছুটা তাৎপর্যবহ হয়েছে। আন্দোলন থেকে দিক নির্দেশনা পেয়ে সাহিত্যিকরা যে এগিয়ে এসেছিলেন তা নয়। তখন দিক নির্দেশনাটাই ছিল মুখ্য, নতুন সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয়া হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হল। আমরা যারা কলকাতায় ছিলাম, তারা ঢাকায় এলাম। নতুন দেশে নতুন রাজনৈতিক সচলতায় আমরা যেন হিল্লোলিত হতে চাইলাম। রেনেসাঁ আন্দোলনের কথা সবাই প্রায় ভুলে গেল, কিন্তু যারা এর প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন কলকাতায় তারা এটাকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইলেন ১৯৪৯ সালে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা উৎসাহী ছিলেন। তাঁর উৎসাহে এ ব্যাপারে প্রথম বৈঠক বসে ৯ নং আরমেনিয়ান স্ট্রীটে সাহিত্যিক আবুল কাশেমের বাসায়। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবু জাফর শামসুদ্দীন,

www.pathagar.com

জহুর হোসেন চৌধুরী, ইদ্রিস আলী, সৈয়দ নুরুদ্দীন, খায়রুল কবীর, ফররুখ আহমদ, মুজিবুর রহমান খাঁ এবং আমি। আরও দু'একজন ছিলেন হয়তো। আজ সুস্পষ্ট তাদের নাম মনে পড়ছে না। এদের মধ্যে খায়রুল কবীর এবং আমি এখনও জীবিত আছি। সাক্ষ্য দেবার মত আর কেউ নেই। আলোচনা সভায় আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় যে একটি ম্যানিফেস্টোর মত তৈরী করা হবে এবং তার নিরিখে আন্দোলনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা হবে। ফররুখ ও আমার ওপর দায়িত্ব পড়ল ম্যানিফেস্টো তৈরির। ম্যানিফেস্টোতে লেখা হলঃ

ক. বাঙালী মুসলমানদের সংসার এবং সমাজ জীবনে যে সমস্ত আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে সাহিত্যে স্থান দিতে হবে।

খ. আমাদের গ্রামীণ জীবনে অর্থাৎ লোক-জীবনে যে সমস্ত লোককাহিনী প্রচলিত আছে অথবা লোক-সংস্কার, সেগুলোকে অবলম্বন করে নতুন সাহিত্য নির্মাণের প্রয়াস পেতে হবে।

গ. দোভাষী পুঁথি যেগুলো এখনও গ্রামবাংলার মানুষকে প্রভাবিত করে এবং গৃহে গৃহে পঠিত হয় সেই দোভাষী পুঁথি অবলম্বন করে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে।

ঘ. ইসলামের ইতিহাস থেকে প্রেরণা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ. বাঙালী মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবন-আকাংক্ষা এবং চৈতন্য নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে।

ম্যানিফেস্টোর মূল কথাগুলো এই ছিল। কিন্তু তার মধ্যে একটি কথা জুড়ে দেয়া হয়েছিল যা পরবর্তীতে আমার জন্য কাল হয়। সম্ভবত তৎকালীন সময়ে পাকিস্তানের প্রতি আমাদের যে উত্তাল যুক্তিহীন আবেগ ছিল সে আবেগের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিতর্কিত কথাগুলো লেখা হয়েছিল। কথাগুলো এই—পাকিস্তানের আদর্শ এবং সংহতির জন্য প্রয়োজন হলে আমরা রবীন্দ্রনাথকেও পরিত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকব। রেনেসাঁর দ্বিতীয় সভা বসে আগামসি লেনে, আবুল কালাম শামসুদ্দীনের বাড়িতে। সেখানে ম্যানিফেস্টোটি পঠিত হয় এবং উপস্থিত সকলের সমর্থনসহ আনন্দের সঙ্গে গৃহীত হয়।

রেনেসাঁ সোসাইটি আর গঠিত হয়নি, কিন্তু প্রবন্ধটি আমার নামে 'মাহে নও' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়ে আমার তথাকথিত রবীন্দ্র বিরোধিতার সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। মনে রাখা দরকার আমার জীবনে ম্যানিফেস্টোতে উল্লেখিত কোন আদর্শই কার্যকর হয়নি। প্রথমতঃ আমার রচনায় আরবী-ফারসী শব্দ আদৌ ব্যবহার করি না, দ্বিতীয়তঃ লোককাহিনী, গ্রামীণ জীবন এবং পুঁথি

www.pathagar.com

সাহিত্য আমার উপজীব্য নয়। তৃতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রয়োজন হয়নি। বরঞ্চ অল্পদিনেই পাকিস্তানের প্রতি আমার মোহভঙ্গ হয়েছিল এবং ক্রমশঃ পাকিস্তানকে অস্বীকার করার সামর্থ আমি অর্জন করেছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গী আমার 'রবীন্দ্রনাথ ঃ কাব্য বিচারের ভূমিকা' গ্রন্থটিতে প্রকাশ পেয়েছে। এই গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গের পণ্ডিতজনের কাছে সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। স্বর্গতঃ প্রবোধ চন্দ্র সেন একটি দীর্ঘপত্রে আমাকে লিখেছিলেন ঃ 'এই কয়দিনে আপনার 'রবীন্দ্রনাথ' বইটি অনেকখানি পড়া হয়েছে। পড়ে আমি বিস্মিত, মুগ্ধ, অভিভূত। এটা অত্যুক্তি নয়। রবীন্দ্র সাহিত্যের এমন বিচার এর পূর্বে আমি পড়িনি। সব বিচারই যেন মস্তিষ্ক-প্রসূত, সাহিত্যিক ন্যায়সূত্রের ছকে ফেলে পরিমাপ করার প্রকাশ অথবা নিছক উচ্ছ্বাস নয়। আপনার এই বিচার যেন এক কবিসত্তা দিয়ে আর এক কবিসত্তাকে প্রকাশ করা। এ বিচার লজিকের বিচারও নয়, ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস তো নয়।'

আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথ দেবতা নন, কিন্তু আমার কাব্যলোকের সারথী। আমি একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে উল্লেখ করে বলেছিলাম ঃ

তোমার পত্রান্তরালের শান্ত বিশ্রামের
কথা ভাবছিলাম
নির্বাচিত শব্দের সঞ্চয়ে
সে বিশ্রাম চিরকাল সবুজ পাতা।

www.pathagar.com

শৈশব স্মৃতি ঃ ধর্মচিন্তা ও মানবতাবোধ

শৈশবে যে সময় ঢাকার গ্রাম ছেড়ে ধামরাই বাবার কর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছাই সে বছরটা বোধহয় ১৯২৮ সাল। আমার জন্ম হয়েছিল যশোরে এবং শিশুকালের যে সময়টুকু যশোরে কাটিয়েছিলাম তার স্মৃতি প্রধানত মা'র মুখে শুনে গড়ে উঠেছিল। সে সময়কার কথাগুলো আমি বলিনি। তখন থেকে চলে এসেছিলাম নানাবাড়ি আগলা পূর্বপাড়ায়, যেটা ছিল ঢাকা শহরের কাছাকাছি। বাবার কর্মস্থল ছিল ধামরাই। আমরা নৌকো করে তাই ধামরাই গিয়ে পৌঁছালাম। সেখানকার একটি অভিজ্ঞতার কথাই বলব যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি সে সময়কার সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে একমাত্র মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করতে শিখেছিলাম। জানতাম কেউ মসজিদে যায়, কেউ মন্দিরে যায়, কেউ ধুতি পরে, কেউ লুঙ্গি পরে অথবা পায়জামা। কিন্তু জীবনের নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকে।

ধামরাই বিখ্যাত ছিল তার রথযাত্রার জন্য। বছরের এক সময় রথকে নতুন করে রথের সঙ্গে দড়ি বেঁধে শহরের প্রধান সড়ক দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হত। তখন যে ধারণা আমি পেয়েছিলাম তা' হচ্ছে যে দেবতা রথে করে যাচ্ছেন, তিনি সুসজ্জিত হয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছেন এবং উল্টোরথের দিনে তিনি তার বধূকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবেন একই পথ দিয়ে। ধামরাই রথের মধ্যে যে দেবতা ছিলেন তার নাম বোধহয় মহেশ, আমার ঠিক মনে নেই। যে সড়ক দিয়ে রথটাকে যেতে হত তার বাম পাশে ছিল জামে মসজিদ। মসজিদের মিনারটি একেবারে রাস্তার কোল ঘেঁষে ছিল এবং বেশ উঁচু ছিল। মিনারের ওপরে ছোট একটা গম্বুজ ছিল এবং গম্বুজের ঠিক মাঝখান দিয়ে একটি লম্বা লোহার দণ্ড সোজা উপরের দিকে দাঁড়িয়েছিল। এ দণ্ডটি রংচং করা ছিল। মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যে একটি অলিখিত নিয়ম ছিল যে রথের চূড়াটি মিনারের চেয়ে উঁচু হবে না। কারণটি বোধহয়, উঁচু হলে মিনারের চূড়ায় রথ বেঁধে যেতে পারে। আমি যে বছরের কথা বলছি সে বছর আবার উড়িষ্যা এবং বিহার থেকে বহু বিত্তশালী হিন্দু এ রথযাত্রায় যোগ দিয়েছিল। তারা টাকা পয়সা দিয়ে রথটাকে আরও চকচকে ঝকঝকে করেছিল এবং শিরোদেশে আরও একটি প্রকোষ্ঠ তৈরি করে বেশ

www.pathagar.com

উঁচু করে তুলেছিল। রথ টেনে নেবার সময় অগনিত লোক রথের কাছি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। বাবার সঙ্গে আমি মসজিদের ছাদে বসেছিলাম। সেখানে আরও কয়েকজন গণ্যমান্য লোক ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মসজিদের কাছে আসতেই যারা রথের কাছি টানছিল তারা কেমন একটা চাপে পড়ে বাঁদিকে হেলে পড়েছিল, যার ফলে রথটি একটু কাত হয়ে যায় এবং রথের চূড়াটি মিনারের উপরের দণ্ডটির সঙ্গে আটকে যায়। চতুর্দিকে তখন প্রচণ্ড হৈ চৈ। রথ টানতে গেলে রথ ভেঙ্গে যাবে, মিনারের চূড়াও ভেঙ্গে যেতে পারে। এ অবস্থায় হিন্দুদের মধ্য থেকে দু'তিনজন সম্মানিত ব্যক্তি অনুমতি নিয়ে মসজিদের ওপর এলেন এবং করজোড়ে বিনীত প্রার্থনা জানালেন যে যদি মিনারের লোহাটাকে কাত করে সরিয়ে দেয়া যায় তাহলে রথটি বাঁধা মুক্ত হয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। অবশেষে দেখলাম যে একটি ছেলে মিনার বেয়ে উঠে লোহাটা রথের কাছ থেকে সরিয়ে বাঁকা করে নীচের দিকে টেনে দিল। হিন্দু সমাজপতিরা মিনারের যতটা ক্ষতি হয়েছে তা পুনঃনির্মাণ করে দেবেন এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। রথ বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর একটি বড় কাসার থালায় করে আমাদের জন্য মিষ্টি হিন্দুদের পক্ষ থেকে পাঠিয়ে দেয়া হ'ল। আমরা সবাই সেই মিষ্টি খুব তৃপ্তির সঙ্গেই খেয়েছিলাম মনে আছে। রথ চলার সময় মসজিদের সামনে দিয়ে প্রবল ঘন্টাধ্বনি, বাঁশি এবং ঢোলক বাজছিল, তদুপরি মসজিদের মিনারেরও এই রথের কারণে কিছুটা ক্ষতি হল। কিন্তু এ নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বাঁধল না। আমার শৈশবে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আমি কোন ধরনের বিরোধ দেখিনি। ক্রমান্বয়ে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন মানুষকে ধর্মের আচরণের দ্বারা চিহ্নিত করতে শিখল তখন থেকেই বিরোধ তৈরি হল। পৃথিবীটা মূলতঃ বিভিন্ন বিপরীতের সমন্বয়। বৃক্ষরাজি, নদী, পর্বত, মনুষ্য এবং প্রাণীকুল এরা সকলেই একে অন্যের বিপরীত অথচ একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা অমৃতের কথা বলি, আমরা মৃত্যুর কথাও বলি। মৃত্যুও বিধাতার দান, অমৃতও বিধাতার দান। উভয়ই বিধাতার বিশুদ্ধতম জ্যোতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রত্যেক ধর্মেই বিধাতাকে জ্যোতির্ময় বলা হয়। ইহুদী বলি, হিন্দু বলি, মুসলমান বলি, সকলের কাছেই তিনি অনন্ত জ্যোতি, পরমতম উজ্জ্বলতা। তার কাছে সব কিছু অভেদ্য ও অভিন্ন হয়ে যায়, তার মধ্যে সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটে। কেননা তিনি প্রেমস্বরূপ। যদি তিনি প্রেমস্বরূপ না হতেন এবং তার মধ্যে সকল বিরোধ নিশ্চিহ্ন না হয়ে যেত তাহলে কেবল আঘাত থাকত এবং মৃত্যুর অনবরত হনন ইচ্ছার কারণে পৃথিবীর মানুষ চিরকাল সন্ত্রস্ত থাকত। আমাদের সমস্ত কর্মের সমস্ত

www.pathagar.com

ইচ্ছার চরিতার্থতা প্রেমের মধ্যে। আমার শৈশবে আমি হিন্দু মুসলমান বিরোধের মীমাংসার মধ্যে এই প্রেমের চরিতার্থতা দেখেছিলাম।

এক একদিন বিকেল বেলা বাবা আমাকে এবং আমার ভাইবোনদেরকে নিয়ে নদীর তীর দিয়ে হাঁটতে যেতেন। নদীর তীর ছিল ফাঁকা। কিছু কিছু গাছ ছিল, প্রধানতঃ বাবলা গাছ। বৎসরের কোন কোন সময় সে গাছগুলোর গা বেয়ে স্বর্ণলতা ছড়িয়ে থাকতে দেখতাম। নদীর তীরেই ছিল বাজার। বাজারের ছোট ছোট ঘর এবং সেখানে মানুষের চলাফেরা নদীর পাশ দিয়েই ভালই লাগত। নদীতে নৌকো বাঁধা থাকত এবং বাজার সেরে লোকেরা নৌকো করে ওপারে চলে যেত। কোন কোন দিন আমাদের চলার সঙ্গে গ্রামেরও কিছু লোক এসে যোগ দিত। তারা চুপচাপ থাকত। চতুর্দিকের শব্দগুলো একটি আনন্দময় ধ্বনি নির্মাণ করে নদীর স্রোতের সঙ্গে মিশে যেত। বাবা পথ চলতে গিয়ে মাঝে মাঝে তত্ত্বকথা বলতেন। সব যে বুঝতাম তা নয়। মনে হত তিনি বলতে চান, এই যে নদী, এই যে মাটি এবং এই যে আশেপাশের লোকালয় সব বিধাতার সৃষ্টি। তিনি তার ইচ্ছা এবং আনন্দের জন্য সৃষ্টিকে বিচিত্র করেছেন। সকাল বেলার দৃশ্য ছিল আরও সুন্দর। সূর্যকিরণ যখন ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ত তখন ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবী উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আমাদের বাড়ির পাশের একটি পুকুরে লাল শাপলা ফুটত, সূর্যকিরণে সেই শাপলা ফুল দেখতে খুব ভাল লাগত। প্রকৃতিদত্ত আবরণের বিচিত্রতায় পৃথিবী যে কত সুন্দর এবং কত মহিমাময় তা শৈশবে আমি যেভাবে বুঝেছি বড় হয়ে ঠিক সেভাবে অনুভব করিনি।

আমার শৈশবে যে জীবনধারা দেখেছি, আমার চতুর্দিকে এখন সে জীবনধারা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বিভিন্ন মানুষকে দেখতাম বিভিন্ন রকমের বেশে এবং এসব মানুষের সামাজিক এবং ধর্মীয় আচরণের মধ্যেও ব্যবধান ছিল। কাউকে দেখেছি মন্দিরে যেতে, সন্ধ্যায় যেখানে কাঁসার ঘন্টা বাজত এর প্রতিমার সামনে পূজারী পূজার উপাচার রাখত। কাউকে দেখেছি মসজিদে যেতে, তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ত। ছোটবেলায় খৃষ্টান কিংবা বৌদ্ধ এদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। কিন্তু এই যে হিন্দু এবং মুসলমান সামাজিক এবং ধর্মীয়ভাবে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করত। এগুলো আমার কাছে অসম্ভব এবং অদ্ভুত মনে হয়নি। কৌতূহল যে না হত তা নয়। তাই মাকে জিজ্ঞেস করতাম যে, এই রকম একেকজন একেক রকম পোষাক পরে কেন অথবা একজন পূজা করে আরেকজন মসজিদে যায় কেন? আমার এখনও মনে আছে মা সংক্ষিপ্ত উত্তরে বলেছিলেন, 'বাবা, চারদিকের গাছপালার দিকে তাকিয়ে দেখতো সব গাছ কি একরকম? সব গাছ কি সবল গাছ? কোন গাছ বিরাট আকৃতির,

www.pathagar.com

চতুর্দিকে ডালপালা ছড়ানো। কোন গাছ লম্বা হয়ে ওঠে, কতকগুলো পাতা ছড়িয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। যেমন সুপারি, নারকেল। আবার কোন গাছকে গাছই বলা যায় না। সেগুলো লতা। কিন্তু সবগুলো আসলে গাছই অর্থাৎ সবারই জন্ম আছে, বৃদ্ধি আছে, ফলমূল দেবার ক্ষমতা আছে এবং অবশেষে মৃত্যুও আছে। মানুষও সেরকম। কেউ ধুতি পরে, কেউ পাজামা পরে, কেউ লুঙ্গি। কেউ মাথায় টুপি দেয়, কারও মাথায় বাবড়ি চুল, কারও মাথা সম্পূর্ণরূপে কামানো। এদের মধ্যে যারা হিন্দু তারা মন্দিরে যায়, পূজো করে আর যারা মুসলমান তারা মসজিদে যায়। কিন্তু সবাই মানুষ। সবারই জন্ম হয়, বিয়ে করে সংসারী হয়, অবশেষে মৃত্যু ঘটে। সুতরাং মানুষকে কখনও অন্য মানুষ ভাবতে নেই অথবা অন্য কোন রকম জীব ভাবতে নেই। সবাই আমরা মানুষ হিসেবে এক। কিন্তু গাছে গাছে যেমন পার্থক্য তেমনি সামাজিক এবং ধর্মীয় আচরণে পার্থক্য আছে।' মা কথাগুলো আরও সহজ করে বলেছিলেন এবং কিছু উদাহরণ দিয়েও বলেছিলেন। আমি অবিকল যে সেরকম উপস্থিত করতে পারলাম তা ঠিক নয়। তবে আমার বিশ্বাস মতে যতদূর সম্ভব মায়ের বক্তব্যটুকু এখানে ঠিকই পেশ করেছি।

আমার শৈশবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন সংঘর্ষ ছিল না। কোন বিরোধ ছিল না। রথের মেলায় উপস্থিত হত হিন্দু-মুসলমান সকলেই। তেমনি ঈদের মেলায়ও হিন্দু-মুসলমান সকলেই উপস্থিত হত। গ্রামে প্রকৃতির যে ঔদার্য, নদীর যে স্নিগ্ধতা এবং বাতাসের যে অনাবিল প্রফুল্লতা সেগুলোই যেন সেকালের মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল।

বাবা মাঝে মাঝে আমাদের বোঝাতেন যে হযরত ইব্রাহীম প্রথমে সূর্যকে আল্লাহ ভেবেছিলেন এবং সূর্য ডুবে গেলে চাঁদকে। কখনও মেঘপুঞ্জকে, কখনও তরঙ্গ বিক্ষোভকে, আবার কখনও বিরাট বৃক্ষকে। কিন্তু আবিষ্কার করলেন সব কিছুরই পরিবর্তন আছে। তখন মনে প্রশ্ন জাগল, তাহলে এই পরিবর্তন এবং শৃঙ্খলা তৈরি করেছে কে? এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই খুঁজে পেলেন। যিনি সকল কিছুরই সৃষ্টিকর্তা এবং সকল কিছুকে পরিচালনা করেন এবং যিনি সকল কিছুরই উর্ধ্বে তিনি আল্লাহ, তিনি পরম বিধাতা। সুতরাং তিনি তাঁর পিতা আজরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, আজর মূর্তি নির্মাণ করতেন তৎকালীন সমাজের প্রচলিত দেবতাদের। ইব্রাহীম সে মূর্তিগুলো ভেঙে ফেললেন। ইব্রাহীম বললেন যে, যারা কথা বলতে পারে না, যাদের একেবারে কোন ক্ষমতা নেই এবং যারা মানুষের হাতে তৈরি, তারা কি করে মানুষের প্রভু হবে? এভাবেই একেশ্বরবাদিতার জন্ম হয়। আমরা মুসলমান হিসেবে হযরত ইব্রাহীমের ধারায় অগ্রসর হয়ে রসূলে খোদা (দঃ) কর্তৃক পরিশুদ্ধ একটি ধর্মবিশ্বাসে

www.pathagar.com

বিশ্বাসী হই, যেখানে মূর্তিপূজা নেই। হিন্দুরা মূর্তিপূজা করে, তারা তাদের মত চলে। তাদের ব্যাপারে আমাদের মাথা গলানো ঠিক নয়, যেমন আমাদের ব্যাপারেও তারা মাথা গলাবে না। আমরা আমাদের বিশ্বাসে অটল থাকব।

আমার অল্প বয়সে বাবা কিংবা মা এসব কথা আমাকে বলতেন। আমি যে সব কথা বুঝতাম তা নয়, কিন্তু এটা বুঝেছিলাম যে আমাদের সমাজের একটা নিজস্ব ধর্মপদ্ধতি আছে এবং আচরণপদ্ধতি আছে, সে পদ্ধতিগুলো আমার অনুসরণ করা কর্তব্য।

আমার শৈশবের কথা বলতে গিয়ে মা অনেক পরে একবার বলেছিলেন যে জন্মগ্রহণ করার পর আমার কানে আযান দেয়া হয়েছিল এবং আযান দিয়েছিলেন আমার নানা। আমার এখন মনে হয় জন্মের পর সুললিত কণ্ঠে একটি শিশুর কানে আযান দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাকে একটি মধুময় মুহূর্তের মধ্যে জাগ্রত করা। এই কথাটি এজন্যই বললাম যে, ইসলামে সর্বপ্রথম যখন আযান প্রবর্তিত হল, তখন সর্বপ্রথমেই অনুসন্ধান চলেছিল একটি সুললিত কণ্ঠস্বরের এবং সে সুললিত কণ্ঠ ছিল হযরত বেলালের। উপমাস্বরূপ বলা হয়েছে যে, হযরত বেলালের আযান শুনে পশুপাখি এবং গাছের পাতা স্তব্ধ হয়ে থাকত। মনে হয় তারা যেন সেই সুললিত সুর লহরী শ্রবণ করছে। আযানের মধ্যে এভাবেই ইসলামের প্রাথমিক যুগেই সঙ্গীতের সুষমা দান করা হয়েছিল— যেন সেই সুষমায় আকৃষ্ট হয়ে সকলেই নামাজের জন্য একত্রিত হয়। সুতরাং শিশুর কানে আযান দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাকে আনন্দের মধ্যে, সুর-সাম্যের এবং সংহতির মধ্যে বরণ করে নেয়া। এটা আপাততঃ ধর্মীয় ব্যাপার বলে মনে হলেও এটি একটি সামাজিক আচরণ এবং বিধি। হিন্দু সমাজেও অনুরূপ বিধি প্রচলিত আছে। তারা শিশুর কানে মন্ত্র দেয়। তাদের মন্ত্র দেয়াটা একটি ধর্মীয় বিশ্বাস। কিন্তু আমার মনে হয় ধর্মীয় বিশ্বাসের চাইতেও এখানে বড় কথা হচ্ছে একটি শিশুকে আমি কর্কশ শব্দের সঙ্গে পরিচিত করাচ্ছি, না সুমধুর সুর লহরীর সঙ্গে? আমার মনে হয় ধর্মীয় চিন্তাকে অস্বীকার না করেও আমরা বলতে পারি যে, শিশু জন্মলগ্নেই পৃথিবীর মধুরতার সঙ্গে পরিচিত হোক এ-ই বোধ হয় আমাদের আন্তরিক অভিপ্রায়, অন্তত শুরুতে বোধহয় তা-ই ছিল।

আমাদের সময় অর্থাৎ আমার শৈশবে একটি শিশু চার-পাঁচ বছরের হলেই হাতে তখ্‌তি দেয়ার রেওয়াজ ছিল। তখ্‌তিটা ছিল রূপোর একটি পাতের মত। আড়াই ইঞ্চির মত চওড়া তিন বা সোয়া তিন ইঞ্চির মত লম্বা। উপরের দিকে ঝুলিয়ে রাখবার জন্য একটা আংটা থাকত। প্রথমে শিশুকে কুরআন শরীফের বর্ণলিপি শেখানো হত। জাফরান গুলিয়ে খাগের

www.pathagar.com

কলম দিয়ে একজন বয়স্ক এবং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি তখ্‌তিতে অক্ষরগুলো লিখে দিতেন, পরে শিশুকে হাতে ধরিয়ে সেই অক্ষরগুলোর উপর দাগ টানতে হত। হিন্দু সমাজে একে বলে হাতে খড়ি। তাদেরও প্রথা ছিল 'ওম' শব্দের দ্বারা মহাদেবের নাম প্রথম লিখে পরে বাংলা বর্ণমালা লিখতে শেখা। উভয় ক্ষেত্রেই দেখছি যে সামাজিক প্রথাকে ধর্মের সাথে কিছুটা যুক্ত করা হয়েছে বটে কিন্তু প্রথাটি মূলতঃ শিক্ষার সূত্রপাতকে পবিত্রভাবে উপস্থাপনা করার পদ্ধতি মাত্র। এ অনুষ্ঠানগুলো উৎসবের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হত। বর্তমানে সামাজিকতার এই সমস্ত পটভূমি আর নেই। কিছুদিন আগে কৌতূহলবশতঃ একটি মণিকারের দোকানে আমি তখ্‌তির কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। মণিকার মুসলমান ছিল। সে জানত তখ্‌তি কাকে বলে। সে হেসে বলল, 'হুজুর, এখন আর তখ্‌তির প্রচলন নেই, এ পর্যন্ত আমার দোকানে কেউ তখ্‌তি চাইতে আসেনি। এখন তো ইংরেজী শিক্ষাটাই বড় কথা। ছেলেমেয়েকে সাহেব-মেম না বানালে তো চলে না। এখনকার বাপ-মায়ের আগ্রহ ছেলেমেয়েকে মডার্ণ করা।' লোকটির কথায় আমার মনে চিন্তা জেগেছিল যে, সত্যিই তো আমরা এখন সৌন্দর্যকে চাই না, আমরা শুধু আধুনিক উল্লাসকে চাই। সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে, জীবনের যে সমৃদ্ধি এবং বিকাশ—এখনকার দিনে তা কোথায়? একজন তুর্কী কবি তার একটি কবিতায় বলেছেন, জীবনের দায়িত্ব কি? জীবনের দায়িত্ব হচ্ছে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা। জীবনে যে আচরণ আমি গ্রহণ করছি সে আচরণ যেন সৌন্দর্যের হয়, সে আচরণ যেন সম্ভ্রমের হয় এবং সে আচরণ যেন আমাকে অকল্যাণ থেকে মুক্ত করতে পারে।

আমাদের জীবনে এ প্রশ্ন করার সময় কি ফুরিয়ে গেল?

আমরা সম্প্রদায়গতভাবে বাস করি। সামাজিক সম্প্রদায় হিসেবে আমাদের যে স্থিতি সেই স্থিতিতে সম্প্রদায় হিসেবে আমাদের স্বাক্ষর বলিষ্ঠ। বহুযুগের এ সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যখন আমরা অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি অথবা তাদের ক্ষতিসাধনে তৎপর হই তখনই আমরা সাম্প্রদায়িক হই। অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধন করে আপন সম্প্রদায়ের সুবিধা নির্মাণ করা একটি অপরাধ। আমাদের দেশে বর্তমানে সেই অপরাধের সুযোগ নেই। আরেকটি কথা ঃ এদেশে ইসলাম প্রচার হয়েছিল বিনয়ী, শান্ত-স্থির এবং প্রেমময় সূফীদের দ্বারা। তার ফলে এদেশে ধর্মান্ধতা সৃষ্টি হয়নি। এদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। সূফীরা বলতেন, যদি কারও চিত্তে কিছু পাবার আকাংক্ষা জাগে, কিন্তু সে যদি আপন আকাংক্ষার নিবৃত্তি মিটিয়ে অন্যের আকাংক্ষা পূরণ করে, তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। সূফীরা সব সময়ই অন্যের সুবিধা এবং স্বার্থের

www.pathagar.com

কথা চিন্তা করতেন, নিজের কথা কখনও চিন্তা করতেন না। তার ফলে আমাদের দেশে ইসলামের একটি করুণাময় রূপ প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং এদেশে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি কখনও গড়ে উঠতে পারেনি। মানুষ ধর্মপ্রাণ হবে, ধর্মকে গ্রহণ করবে নিগূঢ়ভাবে, সমাজে সম্প্রদায়গতভাবে চিন্তা করবে। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনের কথা ভাববে না।

আমার পিতা ধর্মপ্রাণ ছিলেন। ইসলাম ধর্মের সকল আচরণ তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। বর্তমানের মানুষ ধর্মহীন, তাই তারা সাম্প্রদায়িকতার কথা উচ্চারণ করে। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, নিগূঢ়ভাবে ধর্মপ্রাণতা আমাদের মুক্তি দিতে পারবে, অন্য কিছু নয়। মানুষের জীবনের লক্ষ্য হবে সততাসিদ্ধ হওয়া এবং সেখানেই মানুষের মুক্তি।

মানুষের জীবনে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞাই হচ্ছে যথার্থ কুশল। মানুষের চিত্ত এ কুশলগুলোকে সংগ্রহ করে। কখনও চক্ষুর দ্বারা সংগ্রহ করে, কখনও শ্রুতির দ্বারা, কখনও কায় দ্বারা এবং কখনও হৃদয় দ্বারা সংগ্রহ করে। অনবরত পৃথিবীর পথে জ্ঞানকে আশ্রয় করতে গিয়ে মানুষ তার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে। প্রেমের প্রশান্তি উন্মুক্ত হৃদয়ের সাহায্যেই গড়ে ওঠে।

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতা এবং আমি

স্কুলে থাকতে ইংরেজ হেডমাস্টার একদিন আমাদের ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমরা বড় হয়ে, কে কি হতে চাই। এ প্রশ্ন শুনে আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম, সহসা উত্তর দিতে পারিনি। উত্তর দিতে গেলে অতীতের মানুষের কথাই ভাবতে হবে এবং তাদের আদর্শের কথাই ভাবতে হবে। যারা অতীত হয়েছেন, তাদের মধ্যে যাঁরা মহাপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত তাঁদের কারও না কারুর মতই আমাকে হতে হবে।

আমরা যখন উত্তর দিতে পারছিলাম না, তখন ইংরেজ হেডমাস্টার বলেছিলেন, 'তোমরা কেমালের মত হবে।' আমরা বোবার মত চেয়ে আছি দেখে বলেছিলেন, 'কেমালকে চিনছো না, কেমাল, তুরস্কের বীরপুরুষ ছিলেন। আমাদের হেডমাস্টার টি. জে. কলিন্স তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধে বন্দী হয়ে 'কুতুল আমরা' দুর্গ-এ কিছুদিন ছিলেন। এ ঘটনা আমরা শুনেছিলাম। তিনি এসব ঘটনার কথা মাঝে মাঝে বলতেন। তাঁর ভাষায় 'কেমাল বীরপুরুষ আছে, কিন্তু গ্রীকরা কাপুরুষ আছে।' বাড়ি ফিরে বাবার কাছে হেডমাস্টারের একথা বলাতে বাবা বলেছিলেন, 'তুরস্ক এক সময় সমগ্র আরব দেশে নিজেদের অধিকার বিস্তার করেছিল এবং ইউরোপের বহু অঞ্চলও তাদের অধিকারে ছিল। খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্রে তুরস্ক তাদের সাম্রাজ্য হারিয়ে ফেলল। কামাল আতাতুর্ক ধ্বংসের মধ্য থেকে তুরস্ককে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। সেজন্য তিনি একজন আদর্শ পুরুষ। কিন্তু খেলাফতকে নষ্ট করে দিলেন, এটা তাঁর পক্ষে ঠিক হয়নি।' আমি খেলাফত কি তা বুঝিনি। জিজ্ঞেস করাতে বাবা বলেছিলেন, 'খলিফা হচ্ছে মুসলমানদের নেতা। পৃথিবীর সব দেশের মুসলমানদের নেতা। সুলতান আবদুল হামিদ ছিলেন শেষ খলিফা, যাঁর দুর্বলতার ফলে তুরস্কের সাম্রাজ্য ধ্বংস হল। আবদুল হামিদের জায়গায় কামাল আতাতুর্ক এসেছেন। সুতরাং তিনিই তো আমাদের খলিফা হবেন, এটাই তো চেয়েছিলাম।' সে সময় ভারতবর্ষের মুসলমানরা কামাল আতাতুর্কের কাছে বহু অনুনয়পত্র পাঠিয়েছিলেন 'আপনি আমাদের খলিফা থাকুন' একথা বলে। কিন্তু কামাল আতাতুর্ক রাজি হননি। তিনি কলকাতায় তুরস্কের যে কনসাল ছিলেন তাঁর কাছে লিখেছিলেন, 'তুমি ভারতবর্ষের মুসলমানদের জানিয়ে দাও যে, তাদের প্রতি আমার সহানুভূতি

www.pathagar.com

এবং অনুকম্পা আছে, কিন্তু তুরস্কের বর্তমান অবস্থায় খেলাফতের দায়িত্ব নেয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাছাড়া বর্তমান পৃথিবীর পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে খেলাফতের কথা চিন্তা করা সম্ভবপর নয়।' আমার কাছে সে সময়কার রাজনৈতিক বিবেচনা এবং তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, গুরুত্বপূর্ণ ছিল একটি জাতির স্বাধীনতার সংগ্রাম। কামাল আতাতুর্ক বিস্ময়কর রণকৌশলে এবং শাণিত বুদ্ধির মহিমায় তুরস্ককে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন— সেটাই ছিল আমার কাছে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বড় হয়ে তুরস্ক সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জেনেছিলাম। কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে ইসলামের প্রভাব বলয় থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, ইসলামী আইন বিলুপ্ত করে সুইস সিভিল কোড চালু করেছিলেন, তুর্কী ভাষার লিখন পদ্ধতি থেকে আরবী বর্ণমালা বিলুপ্ত করে রোমান বর্ণমালা প্রবর্তন করেছিলেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে সমুচ্চারিত করেছিলেন। এসব সত্ত্বেও কামাল আতাতুর্কের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল; জানবার ইচ্ছা ছিল যে, ইসলামী বিধিব্যবস্থায় তিনি যে পরিবর্তন করেছিলেন সেগুলো কি সাধারণ মানুষ মেনে নিয়েছিল?

তুরস্কের সঙ্গে আমার যোগসূত্র স্থাপিত হয় ১৯৫৭ সালে। করাচীতে একটি সেমিনার হয়েছিল 'ইসলাম এবং ধর্ম' সম্পর্কে। সে সেমিনারে যোগ দিতে এসেছিলেন তুরস্ক থেকে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ডঃ সাররিউলগেনার। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন যে, তুরস্কের জনসাধারণ ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়নি বরঞ্চ ব্যক্তিগত এবং সমাজ জীবনে ইসলামের বিধি তাঁরা পালন করে থাকেন। কামাল আতাতুর্কের ইচ্ছা ছিল তুরস্ককে আধুনিক করা, কিন্তু ইসলাম বিরোধী করা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র শাসনের ব্যবস্থাপনায় কামালের অনুসৃত পথ ইসলাম বিরোধী মনে হয়েছে সত্য, কিন্তু মূলতঃ তা ইসলামের সত্ত্বা বহির্ভূত ছিল না। উলগেনারের বক্তব্যের আমরা কেউ সমালোচনা করিনি। কেননা আমরা তুরস্ক সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। সে বছরই তুরস্কে যখন গেলাম তখন তুরস্ক সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানলাম। ইস্তাম্বুলে আমার যোগসূত্র ছিল সাবরিউলগেনার। ইনি আমাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আমি তুরস্ক সম্পর্কে অনেক কথা জেনেছিলাম। একদিন তিনি একটা রেস্টুরেন্টে খেতে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে আমরা একটি কবরস্থানে গেলাম, উলগেনারের বাবার কবর। অনেকদিন যাওয়া হয়নি বলে উলগেনার সেখানে যাবেন বলে আমাকে জানালেন, আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। উলগেনার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পাঠ করলেন। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কি কবর জিয়ারত করেন?' উত্তরে

www.pathagar.com

তিনি বললেন, 'আতাতুর্কের সময় এগুলো নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। ইসলামের প্রতি সাধারণ মানুষের মনোভঙ্গীর পরিবর্তন আতাতুর্ক ঘটাতে পারেননি। মসজিদে লোকেরা নামাজ পড়তে যায়, নামাজের শেষে অনেকে কোরআন শরীফ পড়ে, কেউবা তস্‌বি গোনে। এগুলো এক সময় নিষিদ্ধ ছিল। এ নিষেধ কেউ মানে না। আতাতুর্ক তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। এখানকার মানুষ ধর্মসাপেক্ষেই জীবন-যাপন করে, যদিও রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা এখনও বিদ্যমান। যেহেতু ইসলামী বিবাহ প্রথা মূলত ধর্মীয় কোন ব্যবস্থা নয় একটি সামাজিক চুক্তিবদ্ধতা মাত্র, সুতরাং আতাতুর্ক বিবাহ এবং তালাক প্রথাকে সুইস সিভিল কোর্টের আওতায় এনেছিলেন। কিন্তু এটাকে কেউ মানে না। এদেশের মানুষ হানাফী এবং সুন্নী। ধর্ম থেকে এরা বিচ্যুত নয়, কিন্তু এরা ধর্মান্ধও নয়।

আমি ইস্তাম্বুলে হালিদা এদিব হানুম-এর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছিলাম। মহিলা তখন অশীতিপর বৃদ্ধা। তিনি সাক্ষাৎকার দিতে পারেননি। তবে ফোনে দু'একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। আমি পাকিস্তান থেকে আসছি শুনে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা মুসলমানরা প্রতাপের সঙ্গে ভারতবর্ষে বসবাস করতে পারতে, কিন্তু তা না করে, পাকিস্তান সৃষ্টি করে একটি মধ্যযুগীয় আবহ নির্মাণ করেছ। তোমরা ইসলামের ক্ষতিসাধন করেছ।' তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন করায় বলেছিলেন, 'হিন্দু বা খৃষ্টান ধর্মের মত ইসলাম মন্দির বা গীর্জা নিয়ন্ত্রিত কোন ধর্ম নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা। সুতরাং একটি মুসলমানের দেশ স্বাভাবিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হবে। আমাদের দেশে সবাই তো মুসলমান। এখানে তো অন্য ধর্মাবলম্বীরা নেই। সুতরাং মুসলমানদের জন্য রক্ষাকবচের প্রয়োজন নেই।'

তুরস্কে অবস্থানকালে আমি ঘুরে ঘুরে ইস্তাম্বুল, আঙ্কারা এবং বুরশা শহর দেখেছি। প্রাচীন সমৃদ্ধির চিহ্ন নিয়ে এই শহরগুলো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক সময় এ অঞ্চলগুলো ছিল প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। গ্রীক সভ্যতা, গ্রীক পূর্ব যুগের সভ্যতা এবং অনেক পরে ইসলামী সভ্যতা এই শহরগুলোকে চিরকালের জন্য চিহ্নিত রেখেছে। ইসলামী যুগে তুরস্কের কাছে খেলাফত আসার পর প্রায় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য তুরস্কের অধীনস্থ ছিল। সে সময় তুরস্কে ইসলামী শাসন প্রবর্তিত ছিল এবং ইসলামী বিচারব্যবস্থার কেন্দ্রভূমিও ছিল তুরস্ক। কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে আধুনিক করবার এবং ধর্মের আওতা থেকে আধুনিক করবার চেষ্টা করলে ইসলামী বিশ্বাস সেখানকার মানুষের মনের গভীরে এমনভাবে প্রোথিত যে সেই বিশ্বাস

www.pathagar.com

থেকে সরিয়ে আনা একেবারেই অসম্ভব। ইসলামী পারিবারিক আইন কামাল আতাতুর্ক তুলে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। তাছাড়া যে দেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান সেদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতাপ অনুভূতই হয় না। কামাল আতাতুর্ক ধর্মনিরপেক্ষতার কথা উচ্চারণ করলেও মসজিদগুলো সংস্কার করেছিলেন এবং মসজিদ পরিচালনার ব্যবস্থা সরকারের হাতে নিয়েছিলেন। এখনও তুরস্কের মসজিদগুলোর পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের। কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে কোন প্রকার ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা দেননি। একটি মুসলমান দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তাই বা কোথায়? তাছাড়া এই ধর্ম প্রচার বন্ধ হওয়ার ফলে খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচার ব্যবস্থা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার নামে কামাল আতাতুর্ক যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তাতে মুসলমানদের উপকারই হয়েছিল।

আমার স্কুল জীবনে আলবেনিয়ার নাম প্রথম শুনি। আলবেনিয়া পূর্ব ইউরোপে একমাত্র মুসলিম প্রধান দেশ। আলবেনিয়ার শাসকের নাম ছিল আনোয়ার হোজা। রাজধানী তিরানার জামে মসজিদে কাজীর সামনে তার বিবাহ অনুষ্ঠানের ছবি কাগজে ছাপা হয়েছিল। এই ব্যক্তি অকস্মাৎ ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে পড়লেন এবং ক্রমান্বয়ে কমিউনিস্ট মতাদর্শী হয়ে ইসলামের অবমাননা আরম্ভ করলেন। মসজিদে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করে দিলেন, অনেক মসজিদকে যাদুঘরে রূপান্তরিত করলেন এবং দেশটাকে সর্বাংশে ধর্মহীন করবার প্রয়াস নিলেন। এই ব্যক্তি মৃত্যুর আগে উইল করে গিয়েছিলেন যে তার যেন জানাজা না হয় এবং তার মৃতদেহকে কবর না দিয়ে যেন পোড়ানো হয়। এই নৃশংস ব্যাভিচারী লোকটি ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আলবেনিয়ায় ধর্মহীনতার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিলেন। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতায় পর্যবসিত হয়। ধর্ম একজন মানুষের জন্মগত অধিকার। সে যদি এ অধিকারকে কার্যকর না করতে পারে, তাহলে মানুষ হিসেবে সে সর্বস্বান্ত হয়। বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি না থাকলে একজন মানুষের মধ্যে বিনয় আসে না, সৌজন্যবোধ আসে না। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। একজন মুসলমান তার ধর্মীয় আবহ নিয়ে জীবনক্ষেত্রে সচল থাকে। পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে এবং বিবিধ কর্মকাণ্ডে প্রত্যয়ের মধ্যে মানুষের জন্য ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োজন। ইসলাম যেহেতু মসজিদশাসিত ধর্ম নয়, সেই কারণে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রশ্রয় প্রতিটি মুসলমান তার জীবন ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। একজন মুসলমান যদি ইসলামের দিক নির্দেশনা অগ্রাহ্য করে কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তাহলে সে নিজেরও ক্ষতি করে, জাতিরও ক্ষতি করে। কামাল

www.pathagar.com

আতাতুর্ক বুদ্ধিমান ছিলেন, তাই তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললেও ইসলামী ব্যবস্থাপনা সমূলে উৎপাটন করবার চেষ্টা করেন নি। আজকে আমরা আলবেনিয়ার পরিণাম দেখছি। সেখানে আবার ধর্মীয় চেতনার অভ্যুদয় ঘটেছে এবং মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় অধিকার ক্রমশঃ ফিরে পাচ্ছে। যা অন্যায় এবং যা প্ররোচিত তাঁর পরাজয় ঘটেই। আজকে পূর্ব ইউরোপে এবং এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়নেও আমরা এর নজির দেখছি।

ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতিমালার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। ভারতের বিঘোষিত রাষ্ট্রীয় নীতি ধর্মনিরপেক্ষতা। বিভিন্ন গোত্রের, বিভিন্ন ধর্মের এবং আচারের মানুষ ভারতে বসবাস করছে। অতীত থেকে এ পর্যন্ত বহু জাতি সে দেশে এসেছে এবং ভারতীয় সত্তায় মিশে যেতে চেয়েছে। অথচ এই মিশ্রণ আজও ঘটেনি এবং ধর্মনিরপেক্ষতা সংখ্যালঘুদের নির্যাতিত করবার একটা উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সকল মানুষ সমান। সুতরাং চাকরি ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার—এই আপ্তবাক্য অবলম্বন করে সংখ্যালঘুদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাছাড়া নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতের একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার। বর্তমানে একটি ধর্মান্ধ হিন্দু মৌলবাদী দল ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এভাবে দেখি, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা মুসলমানদের জন্য এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য একটি দুঃশাসন নিয়ে এসেছে।

১৯৬০ সালের দিকে পাকিস্তানের প্রখ্যাত আইনবিদ এবং পণ্ডিত এ. কে. ব্রোহী ভারতে পাকিস্তানের হাই কমিশনার নিযুক্ত হন। দিল্লী যাবার প্রাক্কালে আমি করাচীর হোটেল মেট্রোপলে তাঁকে একটি সংবর্ধনা জ্ঞাপন করি। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে করাচীর অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সংবর্ধনার উত্তরে ব্রোহী সেদিন বলেছিলেন, 'আমি চিরকাল বিশ্বাস করি যে, ধর্মের অধিকার নিয়েই মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে। ধর্মের অধিকার মানুষকে উদার করে, পরমতসহিষ্ণু করে এবং সকলকে সমভাবে গ্রহণ করবার অঙ্গীকারের জন্ম দেয়। পাকিস্তান একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র এবং ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এই উভয় রাষ্ট্রের মৌল উপাদান হচ্ছে মানুষ। সেই মানুষ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী। এই মানুষগুলো তাদের ধর্মীয় প্রত্যয়ে একে অন্যের সান্নিধ্যে আসুক এটাই আমি চাই।' এ. কে. ব্রোহী তাঁর অনবদ্য বাচনভঙ্গীতে আরও অনেক কথা বলেছিলেন যা আমি এতদিন পর ঠিক মনে করতে পারছি না। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শেষে হাস্যরসের উপকরণ যুগিয়েছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তখন পাকিস্তানে মৌলিক গণতন্ত্র সবেমাত্র প্রবর্তিত হয়েছে। এটাকে উপলক্ষ করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব ব্রোহীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তো মৌলিক গণতন্ত্রের

www.pathagar.com

ধ্বজাবাহী হয়ে ভারতে চললেন। সেখানকার লোকেরা যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে মৌলিক গণতন্ত্র কি, তার উত্তরে আপনি কি বলবেন?' ব্রোহী বললেন, 'এটার আর অসুবিধা কি? মৌলিক গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা তো সরকার থেকে দিয়েছেই, সেই ব্যাখ্যা কি আপনার পছন্দ নয়?' সোহরাওয়ার্দী সাহেব বললেন, 'আমি মৌলিক গণতন্ত্রের একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। দেখুন, আপনার পছন্দ হয় কিনা—এর অর্থ মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে একটি নিকৃষ্ট গণতন্ত্র। বেস শব্দটার অর্থ করেছিলেন নিকৃষ্ট। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কথায় সবাই হেসে উঠেছিলেন।

১৯৬১ সালে ভারত সরকার একটি পাক-ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আহবান করে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ তারাচাঁদ এ সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন। পণ্ডিত নেহেরুর সমর্থনে এই সম্মেলন আহবান সম্ভবপর হয়েছিল। এই সম্মেলনে অংশ নিতে আমি দিল্লী গিয়েছিলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পণ্ডিত নেহেরু প্রধান অতিথি ছিলেন, সভাপতিত্ব করছিলেন ডঃ তারাচাঁদ। ভারতের পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন হুমায়ুন কবীর এবং পাকিস্তানের পক্ষে এ. কে. ব্রোহী। হুমায়ুন কবীর তার বক্তব্যে বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষে বহু জাতি এসে মিলিত হয়েছে, যেমন করে বিভিন্ন শাখা নদী এক বৃহৎ নদীর স্রোতে মিলিত হয়। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে সকল মানুষের একীভূত তাৎপর্যই আমরা লক্ষ্য করি। দারা শুকোহ্ যাকে বলেছেন, 'মযমউল বাহরাইন'—অর্থাৎ সকল ধারার সংগম, ভারতবর্ষ হচ্ছে তাই।' এর উত্তরে ব্রোহী সাহেব বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে সজীব অঞ্চলগুলো বৈচিত্রময়। একেক অঞ্চল একেক রকম, এক অঞ্চলের ফলমূল বৃক্ষলতার সঙ্গে অন্য এলাকার ফলমূল, বৃক্ষলতার মিল নেই, অথচ সজীবতার অধিকারে এরা একে অন্যের সঙ্গে সম্প্রীতিতে অবস্থান করে। কিন্তু মরুভূমি সর্বত্রই এক। সর্বত্রই একই রকমের উষ্ণতা, একই রকমের বৃক্ষলতা, উষরতায় পৃথিবীর সব দেশের মরুভূমি একই রকম। আমরা উষরতাকে চাই না, আমরা সজীবতাকে চাই। তাই সংস্কৃতিতে আমরা মানুষের বৈচিত্রের সন্ধান করি। বহু জাতি এ উপমহাদেশে এসেছে ঠিকই, কিন্তু প্রত্যেক জাতিই নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতি নিয়ে একে অন্যের থেকে ভিন্ন হয়ে রয়েছে। এই ভিন্নতার মধ্যে আমরা বৈচিত্র্যের আস্বাদন পাই।'

ব্রোহীর বক্তৃতা শুনে পণ্ডিত নেহেরু একটু চমকে উঠে, ঘাড় তুলে তাকালেন, কিছুক্ষণের জন্য মাত্র। তারপরই মাথা নীচু করলেন। নেহেরুকে অনেকটা স্তিমিত দেখাচ্ছিল, বার্ধক্যের কারণে তাঁর মধ্যে কোন সতেজ স্ফূর্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল না। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত নেহেরু দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন, চা-চক্রে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন

www.pathagar.com

না। সেদিন ব্রোহীর বক্তব্য খুবই অনবদ্য হয়েছিল। সত্যিই মানুষ ধর্মগত বিভিন্নতা নিয়ে পৃথিবীতে বড় হয় এবং একে অন্যের সান্নিধ্যে আসে। তাছাড়া গোত্র এবং বর্ণগত বিভিন্নতা তো আছেই। সেদিন সন্ধ্যায় একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ছিল। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ডঃ তারাচাঁদ পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সবার সঙ্গে খোলামেলা কথাবার্তা বলছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁকে কাছে পেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ভারতের সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ জনসাধারণ কি গ্রহণ করেছে?' উত্তরে ডঃ তারাচাঁদ বললেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ একটি আদর্শ, জনতার মধ্যে এটা সংক্রমিত হতে সময় নেবে। এদেশের মানুষ বর্ণ, গোত্র এবং ধর্মের ভিন্নতার মধ্যে বাস করে। এই ভিন্নতা সত্ত্বেও যাতে তারা একে অন্যকে সম্প্রীতিতে গ্রহণ করতে পারে সেটাই আমাদের কাম্য।' আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'আদৌ এ সম্প্রীতি কখনও নির্মিত হবে কি?' আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে ডঃ তারাচাঁদ বললেন, 'আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন না, আমি হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি সত্য, কিন্তু বন্ধুত্ব-বৃত্তের মানুষগুলো সবাই প্রায় মুসলমান। আমি ফারসী ভাষার চর্চা করেছি আজীবন, আমি মুশায়রা পছন্দ করি, মুসলমানদের সংস্কৃতিতে আমার অধিকার এবং সমর্থন আছে। এরকম মানুষ ভারতবর্ষে ক্রমশঃ তৈরি হবে।'

পরের দিন পাকিস্তান হাই কমিশনের অফিসে ব্রোহীর সঙ্গে দেখা করলাম। ব্রোহীর সঙ্গে একই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হল। ব্রোহী বললেন, 'কোন সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা বিধিবদ্ধ রাখা আমি ঠিক মনে করি না, কেননা মানুষ কখনই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। এটা লেখা থাকলেই যথেষ্ট যে, দেশের মানুষের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ধর্ম কোন প্রতিবন্ধক হবে না। আসল উদ্দেশ্য তো তাই। নিজস্ব ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতা থাকবে এবং ধর্ম বিশ্বাসের কারণে একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হবে না। ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা সংবিধানে যুক্ত করেছে পণ্ডিত নেহেরুর জন্যই। নেহেরু পরিবার কোন বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, এদের মধ্যে একটা ঔদার্য আছে, সহনশীলতা আছে, যা সাধারণত ভারতবর্ষে দেখা যায় না।'

সাম্প্রতিক ইতিহাসে আমরা লক্ষ্য করি, হিন্দু মৌলবাদিতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং সে দেশের কোন রাজনৈতিক দলই বলিষ্ঠভাবে এর বিরোধিতা করতে সাহসী হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে, সে দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম বিশ্বাস রাজনীতিতে প্রভাব ফেলছে এবং এর ফলে নির্যাতিত হচ্ছে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় এবং অচ্ছ্যুৎ সম্প্রদায়। সে দেশে সাম্প্রদায়িকতার যে ঘৃণ্য স্বরূপ উদঘাটিত হতে দেখেছি, তাতে মানুষ

www.pathagar.com

হিসেবে আমি লজ্জাবোধ করি। সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় শ্লোগানে পরিণত হয়েছে মাত্র, মানুষের বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ঘোষণা করেছিলাম। সম্ভবতঃ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে। যশোরের মুক্তাঞ্চলে একটি জনসমাবেশে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত হবে। তিনি কার সঙ্গে পরামর্শ করে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন জানি না। পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানরত বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের কারও সঙ্গেই তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করেন নি। তিনি সেদিনের বক্তৃতায় আরও বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠানের নামের আগে মুসলিম, মুসলমান বা মোহামেডান শব্দটি থাকবে না। এই হাস্যকর ভ্রষ্টবুদ্ধি ঘোষণাটি আমাদের ভবিষ্যত জীবনকে সংকটাপন্ন করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধর্ম নিরপেক্ষতার অপব্যাখ্যা ঘটতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সিণ্ডিকেটের সভায় উপাচার্য ডঃ মোজাফফর আহমদ প্রস্তাব করেন যে, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হোক। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই সিণ্ডিকেটের সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। আমিও এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিনি। অনেক দিন পর এজন্য আজ একটি প্রবল অপরাধবোধে আমি মানসিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছি। মনে আছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ নূরুল হাসান ঢাকায় এসেছিলেন। ভারতীয় হাই কমিশনারের বাসায় একটি নৈশভোজে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছিলাম। সেখানে আকস্মিকভাবে তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনারা সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিলেন কেন?' আমি উত্তরে বলেছিলাম, 'ধর্মনিরপেক্ষতা প্রমাণের জন্য।' তিনি আমার উত্তরে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'বৃটিশ আমল থেকে এই নামটি রয়েছে। তাছাড়া নবাব সলিমুল্লাহ বঙ্গ বিভাগের প্রেক্ষাপটে মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি আবাসিক হল নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং অর্থের যোগান দিয়েছিলেন। ইতিহাসের এই সত্যকে উপেক্ষা করে আপনারা যে কাজটি করেছেন তার আইনগত এবং নীতিগত কোন ভিত্তি নেই। ভারতের বিঘোষিত নীতি হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু সেদেশে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। ইতিহাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমরা 'হিন্দু' এবং 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেইনি। আপনারা এক্ষেত্রে মস্তবড় ভুল করেছেন।' নূরুল হাসানের বক্তব্যের সারবত্তা আমি বুঝতে

www.pathagar.com

পারলাম। আমি লজ্জিত হলাম। নূরুল হাসান সাহেবও এ ব্যাপারে আর কিছু না বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আমরা অনেক অপকর্মের উদ্ভাবনা করেছি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে মাদ্রাসার শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী অনুদান সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়ার প্রস্তাবটি। তৎকালীন শিক্ষা সচিব এই অনুদান বন্ধ করে দেয়ার প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কাছে করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। উপরন্তু তিনি মাদ্রাসার অনুদান বৃদ্ধি করেছিলেন। এর পরে আলিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, মাদ্রাসার শিক্ষার উন্নয়নের জন্য তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। তিনি মাদ্রাসার শিক্ষক এবং ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'আসুন আমরা মিলিতভাবে দেশ থেকে ঘুষ, জুয়া ইত্যাদি অনৈসলামিক কাজের উচ্ছেদ ঘটাই। আমি রেস খেলা বেআইনী ঘোষণা করেছি। আপনারা আমার হাতকে সুদৃঢ় করুন। সর্বপ্রকার পাপের মূলোচ্ছেদ না করলে এদেশকে রক্ষা করা যাবে না।' সে সময় ধর্মনিরপেক্ষতার আরও একটি শিকার হতে গিয়েছিল বাংলাদেশ টেলিভিশন। টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেন যে, টেলিভিশন থেকে কোন প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচার কবা হবে না এবং নিয়মিতভাবে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত প্রচার করাও হবে না। এর পরিবর্তে তারা কিছু বাণী প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থাও শেখ সাহেবের হস্তক্ষেপের ফলে কার্যকর হয়নি। এ উপলক্ষে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ঢাকার চানখাঁর পুলের আওয়ামী লীগ কর্মীরা একটি উৎসবের আয়োজন করে। সেখানে গান-বাজনা এবং বাজি পোড়ানো হবে। এই সিদ্ধান্ত হয়। কর্মীরা এ উৎসবের জন্য বঙ্গবন্ধুর কাছে কিছু অর্থ সাহায্য চেয়েছিল। তিনি সাহায্য দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু নির্দেশ দিয়েছিলেন যে গান-বাজনা এবং বাজি পোড়ানোর পরিবর্তে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করতে। বলেছিলেন, 'মুসলমানদের উৎসব হচ্ছে মিলাদ। মুসলমানরা কোন কিছুতে সফলকাম হলে এবং খুশী হলে মিলাদ পড়ায়।'

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ঈদুল ফিতর উদযাপন করেছি কলকাতায় এবং স্বাধীন বাংলাদেশে ঈদুল আযহা উদযাপন করলাম। এ সময় ধর্ম নিরপেক্ষতার সপক্ষে নানাবিধ বিবৃতিদাতাদের উদ্ভব হল। একটি বিবৃতি ছিল সে বছরের কোরবানীর বিরুদ্ধে। বিবৃতিতে বলা হয়েছিল ঃ মুক্তিযুদ্ধে যেহেতু বহু প্রাণহানী ঘটেছে তার আত্মত্যাগই তো কোরবানীর সামিল।

www.pathagar.com

সুতরাং নতুন করে কোরবানীর নামে প্রাণী হত্যা করা সমীচীন নয়। আমারও তখন মনে হয়েছিল, কোরবানী যেহেতু ত্যাগের অনুষ্ঠান, সুতরাং বহু মানুষের ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের জাতির কোরবানী দেয়া হয়ে গেছে। নতুন করে প্রাণী হত্যার প্রয়োজন নেই। পত্রিকায় এই বিবৃতি দেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ ইসহাক আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, 'আলী আহসান সাহেব, কোরবানীর কোন বিকল্প নেই। যার উপর কোরবানী ফরজ, তাকে কোরবানী দিতেই হবে। দেশের জন্য মানুষের যে আত্মত্যাগ; সেটার সম্মান আল্লাহতায়ালা করবেন, সেই আত্মত্যাগকে কোরবানীর বিকল্প হিসেবে কখনই ধরা যাবে না।' ইসহাক সাহেবের কথায় আমার চৈতন্যোদয় হল। আমি সেই বছর কোরবানী দিয়েছিলাম। এভাবে দেখতে পেয়েছি যে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মের অপব্যাখ্যা আমরা করেছি এবং ধর্মাচরণের বিকল্প উদ্ভাবনের প্রয়াস পেয়েছি।

সে সময় ধর্মনিরপেক্ষতার অজুহাতে মাদ্রাসার শিক্ষার বিরুদ্ধেও বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি বেরিয়েছে। বলা হয়েছিল, আধুনিককালের সময়োপযোগী, একই ধারার শিক্ষা আমাদের দেশে থাকা উচিত। মাদ্রাসা শিক্ষা একটি মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা, এর অবসান ঘটিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্বৈত ব্যবস্থা দূর করা একান্ত প্রয়োজন। এসব বিবৃতি শেষ পর্যন্ত কোন গুরুত্ব পায় নি। কিন্তু এসব বিবৃতির ফলে তরলমতি ছাত্রদের মনে সংশয় দেখা দিতে আরম্ভ করে। এভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আমরা যুব সম্প্রদায়কে ধর্মবিমুখ করতে আরম্ভ করি।

আমাদের দেশের মানুষ স্বভাবতই ধর্মপ্রাণ এবং কর্মনিষ্ঠ। তাঁরা তাঁদের পারিবারিক এবং সামাজিক ক্রিয়া-কর্মে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলেন। ধর্ম তাঁদের সর্বাঙ্গীন অস্তিত্বের সাথে জড়িত। দীর্ঘদিনের ইতিহাসে দেখা গেছে যে, আমাদের দেশের মানুষ ধর্মান্ধ নয়, তারা সহজেই অন্য সব ধর্মাবলম্বীদের সাথে সহাবস্থান মেনে নেয়। সুতরাং এদেশে মানুষকে ধর্মের চৈতন্য থেকে সরিয়ে আনা একেবারেই অসম্ভব।

আমাদের দেশে কার্যত দেখা গেছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার প্রশ্রয় ঘটাবার প্রয়াস চলেছিল যার ফলে মানুষের মনে বিক্ষুব্ধতা জাগছিল। এই বিক্ষুব্ধতা দেশের শান্তির জন্য কখনই কাম্য ছিল না।

www.pathagar.com

শুধুমাত্র নগরবাসী মুষ্টিমেয় নাস্তিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা যদি এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সে ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যর্থ হতে বাধ্য, আমাদের এদেশেও তাই হয়েছে।

ধর্মীয় নীতি মানুষকে উদার এবং সহনশীল করে। অন্যপক্ষে ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি অসদাচরণের মত। কেননা দেখা গেছে যে, যারা ধর্ম নিরপেক্ষতার দোহাই দেন তাঁরা মূলত ধর্মবিরোধী।

www.pathagar.com

আইয়ুব খান এবং আমি

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সঙ্গে আমার কখনই মুখোমুখি সাক্ষাৎকার ঘটেনি। যখন মার্শাল ল' জারি হয়, তখন আমি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান। পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা ছিল একটি অবহেলিত বিষয়। সুতরাং বাংলার অধ্যাপক হয়ে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সান্নিধ্যে যাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। শিল্পী ও সাহিত্যিকগণকে সরকারী প্রচারযন্ত্রের আয়ত্বে আনবার জন্য যে রাইটার্স গিল্ড বা লেখক সংঘ গঠিত হয় আমি তার সদস্য ছিলাম না। গিল্ডের সদস্যরা আইয়ুবের সাক্ষাৎকার পেয়েছেন, তাঁর মৌলিক গণতন্ত্রের পক্ষে তাঁরা গল্প লিখেছেন। আমি গিল্ডের সদস্য ছিলাম না বলে এ ধরনের কর্মসম্পাদনার দায়িত্ব আমার ওপর পড়েনি। মৌলিক গণতন্ত্রের প্রচারাভিযানে আইয়ুব খান যখন 'পাক জমহরিয়াত' ট্রেনে করে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণ করছিলেন তখন গিল্ডের সদস্যদের অনেকেই তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। আমি যেহেতু গিল্ডের সদস্য ছিলাম না সুতরাং এই সফরসঙ্গী হবার সুযোগ থেকে আমি অব্যাহতি পেয়েছিলাম।

পুঁজিপতিদের অর্থানুকূল্যে যে দু'টি পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছিল, তার কোনটাই আমি গ্রহণ করিনি। আমাকে দাউদ পুরস্কার দেয়া হয়েছিল কিন্তু সে পুরস্কার আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। সুতরাং আইয়ুবের হাত থেকে পুরস্কার নেবার সুযোগ আমার হয়নি, আমি তার সঙ্গে করমর্দন করিনি।

১৯৪৮ সালে আমি যখন রেডিও পাকিস্তান ঢাকায় চাকরি করি তখন আইয়ুব খান ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমাণ্ড্যান্ট বা জিওসি। রেডিও'র স্টেশন ডিরেক্টর ছিলেন ক্যাপ্টেন আহসানুল হক। তাঁর সঙ্গে আইয়ুব খানের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁরা উভয়েই একে অন্যের পান ভোজনের সঙ্গী ছিলেন। কি উপলক্ষে যেন নাজিম উদ্দিন রোডের রেডিও অফিসে আহসানুল হক আইয়ুবকে ডেকে এনেছিলেন। সেদিন প্রথম আমি আইয়ুব খানকে দেখি—দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ পুরুষ, পদক্ষেপে দৃঢ়প্রত্যয়ী এবং হাস্যোজ্জ্বল। তাঁকে দেখে আমার খারাপ লাগেনি। আহসানুল হকের সঙ্গে তিনি সরাসরি দোতলায় চলে গেলেন। সে বছরই অল্প দিন পরে দ্বিতীয়বার তাঁকে দেখলাম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র

www.pathagar.com

আগমন উপলক্ষে। নতুন ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি মার্চপাষ্টে জিন্নাহ সাহেব সালাম নিচ্ছিলেন। মঞ্চের উপর তাঁর একটু পিছনে আইয়ুব খান দাঁড়িয়েছিলেন। রেডিওর পক্ষ থেকে সম্প্রচারের জন্য আমি এবং জয়নুল আবেদীন মঞ্চের পিছনে বসেছিলাম। জিন্নাহ সাহেব এবং আইয়ুবের মধ্যে দু'একটি বাক্য বিনিময় যা হয়েছিল তা আমি শুনেছিলাম। মার্চপাষ্টের ফাঁকে অথবা হয়ত শেষে জিন্নাহ সাহেব বাঙালী সৈনিকদের দিকে লক্ষ্য করে আইয়ুব খানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আর দে এনি গুড', (এরা কি কোন কাজের?) আইয়ুব উত্তর করেছিলেন, মনে আছে 'সো সো' (চলনসই)। তখনই আমার মনটি বিরূপ হয়। এরপর ঢাকায় আইয়ুবকে আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

১৯৫৪ সালে আমি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করি। বিভাগটি ছিল ক্ষুদ্র, ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট ৩ জন। শিক্ষক ছিলাম আমি এবং মোস্তফা নূরউল ইসলাম। করাচীতে অবস্থানকালে আমি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হই। আন্তর্জাতিক লেখক সংঘ বা পি.ই. এন.-এর পাকিস্তান শাখার সেক্রেটারী নিযুক্ত হই এবং আন্তর্জাতিক কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডমের মহাব্যবস্থাপক বা সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হই। এই প্রতিষ্ঠান দু'টির সঙ্গে সে সময় যুক্ত ছিলেন প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দী, ডাঃ মাহমুদ হোসাইন, এ. কে. ব্রোহী, প্রফেসর আহমদ আলী, আজিজ আহমদ এবং জি. আল্লানা প্রমুখ খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আমি আমার প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হই। ১৯৫৫ সালে 'ধর্ম এবং স্বাধীনতা' নামে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের আয়োজন করি। উক্ত আলোচনা চক্রে ঢাকা থেকে ডঃ মযহারুল হক, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা এবং হাসান জামান যোগ দেন এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে তিন জন অতিথি এসেছিলেন, ভারত থেকে আমার বন্ধু এ. বি. শাহ এসেছিলেন। এক পর্যায়ে করাচীর উপকণ্ঠে মালিরে ডাঃ মাহমুদ হোসাইনের আমন্ত্রণক্রমে আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম।

১৯৫৬ সালে আমি প্রথম লণ্ডন যাই এবং সেখান থেকে প্যারিসে। ফেরার পথে কায়রোতে অবস্থান করেছিলাম এক সপ্তাহ। সে সময় সহজ সুস্থ অমলিন একটা জীবনধারার মধ্যে আমি প্রবাহিত ছিলাম। কিন্তু অকস্মাৎ পরের বছর মার্শাল ল' এল এবং সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে গেল। আইয়ুবকে নতুনরূপে আবির্ভূত হতে দেখলাম। মার্শাল ল' জারির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো শাস্তির ফিরিস্তি ঘোষণা করা হল—পথঘাট পরিষ্কার রাখতে হবে, রাস্তায় জঞ্জাল ফেললে সাজা পাঁচ বছর, পথে থুথু ফেললে এক বছর, রাস্তার ধারে

www.pathagar.com

প্রস্রাব করলে পাঁচ বছর এবং আরও নানা রকম হাস্যকর শাস্তি। আমি এবং আমার ছোট ভাই আলী আশরাফ, আমরা নাজিমাবাদ দুই নম্বর ব্লকে পাশাপাশি দু'টো বাড়িতে থাকতাম। বাড়ির সামনে ফুটপাতের জন্য অনেকটা ফাঁকা জায়গা ছিল। ফুটপাতের প্রয়োজন হয়নি কেননা রাস্তা অনেক চওড়া ছিল এবং গাড়ি ঘোড়া এক প্রকার ছিলই না বলা যায়। কে.ডি.এ. অর্থাৎ করাচী উন্নয়ন সংস্থার অনুমতিক্রমে আমরা বাড়ির সামনে সুন্দর বাগান করেছিলাম। যেদিন মার্শাল ল' জারি হয়, তার পরের দিন মার্শাল ল'র নির্দেশক্রমে কতকগুলো লোক একজন জওয়ানের নির্দেশক্রমে হৈ হৈ করে এসে আমাদের বাগান ধ্বংস করে দিয়ে গেল। বাধা দিতে গেলে তারা বলল, মার্শাল ল' রেগুলেশনে সরকারী কাজে বাধা দেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। আমরা যতই বলি যে, আমরা বাগান করার অনুমতি নিয়েছি, ততই তারা বলে যে অনুমতি নেয়াটাও বেআইনী হয়েছে। কিন্তু যে ঘটনা আমাদের সবচেয়ে বেশি চিন্তিত করল তা হচ্ছে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বাঙালী কর্মচারীর অপমান। ওঝিউল্লাহ নামক নোয়াখালীর এক নিরীহ ব্যক্তি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা বিভাগের কেরাণী ছিলেন। ভদ্রলোক বন্দর রোডের ওখানে ঘর নিয়ে থাকতেন একা। তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা নোয়াখালীতেই থাকত। তিনি প্রতিদিন একটি খাটো পায়জামা, কালো শেরওয়ানী এবং মাথায় লালটুপী পরে অফিসে যেতেন। কোনদিন এর ব্যতিক্রম দেখিনি। ভদ্রলোকের অভ্যেস ছিল রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে থেমে পায়জামার বাঁধনটা কষে নিতেন। বন্দর রোড দিয়ে যাবার সময় একদিন প্রতিদিনের অভ্যেসমত ভদ্রলোক একটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে পায়জামার ফিতে কষে বাঁধছিলেন। ঘটনাটি একজন পুলিশের দৃষ্টিতে পড়ে। সে ওঝিউল্লাহকে ধরে মার্শাল ল' কোর্টে চালান দেয়, বলে যে, ভদ্রলোক বড় রাস্তার ধারে প্রস্রাব করছিলেন। আমরা যখন এ খবর পাই তখন বিখ্যাত আইনজীবী হাসান আলী এ. রহমানকে ওঝিউল্লাহর জন্য নিযুক্ত করি। হাসান আলী বললেন, খালাশ করা তো কঠিন হবে, তবে একটু দুষ্টবুদ্ধি প্রয়োগ করে দেখব কিছু করা যায় কিনা।' তিনি কোর্ট থেকে কিছু সাক্ষী যোগাড়ের জন্য একদিনের অনুমতি চাইলেন। তিনি কৌশল করে জানলেন যে, যে কনস্টেবলটি ওঝিউল্লাহকে চালান দিয়েছে তার ছেলে সে বছরই বি.এ পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে। এদিকে ওঝিউল্লাহ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বিভাগের কর্মচারী। এ দুটি ঘটনাকে জড়িয়ে তিনি কনস্টেবলটিকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করে ওঝিউল্লাহকে খালাশ করে আনেন। কোর্টের অনুমতি নিয়ে তিনি কনস্টেবলকে জেরা করতে থাকেন। তিনি কনস্টেবল ও তাঁর ছেলের নাম

www.pathagar.com

আগেই জেনে নিয়েছিলেন। এজলাসে দাঁড়িয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম গুলরুখ খাঁ?' কনস্টেবল বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ছেলের নাম মনওয়ার খাঁ? ছেলে বি.এ পরীক্ষা দিয়েছিল?' কনস্টেবল বলল, 'হ্যাঁ।' আবার প্রশ্ন করা হল, তোমার ছেলে পরীক্ষায় ফেল করেছে? কনস্টেবলের উত্তর ছিল 'হ্যাঁ' এরপর অকস্মাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার ছেলে ফেল করতে যাচ্ছে শুনে তুমি ওঝিউল্লাহ সাহেবকে ঘুষ দিতে গিয়েছিলে, কিন্তু ওঝিউল্লাহ সাহেব ঘুষ নেননি, সেজন্য শত্রুতাবশতঃ তুমি মিথ্যা মামলা সাজিয়ে ওঝিউল্লাহকে মার্শাল কোর্টে হাজির করেছো। বল ঠিক কিনা?' কনস্টেবল প্রতিবাদ করতে লাগল, 'নেহি, নেহি।' কনস্টেবলের 'নেহি' শুনে স্থানীয় মার্শাল ল' এ্যাডমিনেস্ট্রেটর লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, 'তোম এতনে ওয়াক্ত এ জ্বি হ্যাঁ বোলা, আওর আভি নেহি নেহি বোলতা হ্যায়, তোম বদমাস হ্যায়।' অর্থাৎ তুমি এতক্ষণ পর্যন্ত সব কথা স্বীকার করছিলে, এখন অস্বীকার করা আরম্ভ করেছো, তুমি নির্ঘাৎ বদমাস। ওঝিউল্লাহ খালাশ পেয়ে গেল। এই কৌতুককর বিচারকার্য দেখে আমরা হাসব না কাঁদব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মার্শাল ল'র বিচার এরকমই ছিল। সৈনিকরা 'হ্যাঁ' শুনতে অভ্যস্ত 'না' শুনতে অভ্যস্ত নয়।

যেদিন মার্শাল ল' জারি হয় তার সাতদিন পর সম্ভবত আমার লণ্ডনে যাওয়ার কথা ছিল। তখন মার্শাল ল'র ঘোষণায় সকল বিদেশযাত্রা বাতিল করা হয়েছিল। একমাত্র মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই বিদেশে যাওয়া চলবে। আমি বন্দর রোডে জোনাল মার্শাল ল' অফিসে অনুমতি চাইতে গিয়েছিলাম, কিন্তু অনুমতি মেলে নি। উপরন্তু আমাকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল আমি যেন ভবিষ্যতে এ ধরনের আবেদন নিয়ে না আসি।

মার্শাল ল'র জন্য পাকিস্তানের মানুষের কোন রকম মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। প্রচলিত আইনের একটা বিধিবদ্ধতা থাকে, একটি যুক্তির ধারাক্রম থাকে, সাক্ষ্যগ্রহণের মাধ্যমে সত্য উদঘাটনের প্রয়াস থাকে এবং অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে শাস্তির ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু পাকিস্তানের মার্শাল ল' এগুলোর কিছুই মানেনি। তারা রাতারাতি অতীব দ্রুততার সাথে নিয়মতান্ত্রিক আইনগুলো বাতিল করে, শাস্তি প্রবর্তনের জন্য কতকগুলো আইন প্রণয়ন করলেন। তাদের কোন সাক্ষ্য প্রমাণের ব্যবস্থা ছিল না, কোন নালিশ এলে সেটাকেই সত্য বলে মেনে নিয়ে বিচারের প্রহসন করত। প্রথম মার্শাল ল'র সময় এটাই আমি লক্ষ্য করেছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিদেশ যাত্রার ওপর এক নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। সরকারী অনুমোদন ব্যতিরেকে কেউ বিদেশে যেতে

www.pathagar.com

পারবে না—এই নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। অনুমতি পাওয়া সময়সাপেক্ষ ছিল এবং অনেকে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেও বিদেশের অনুষ্ঠানে যেতে পারেননি। আমিও একবার যেতে পারিনি। এ ব্যবস্থাটি আমাদের ক্ষোভের কারণ হলেও আমাদের কোন করণীয় ছিল না। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সিকিউরিটির প্রয়োজনে যারা ডিগ্রী পাবে তাদেরকে পেছনের সারিতে বিভিন্ন গ্রুপে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। ছাত্রদের এতে প্রবল আপত্তি ছিল। তাঁদের দাবী ছিল যে, তারা চ্যান্সেলরের হাত থেকে সনদপত্র নেবে এবং তার সঙ্গে করমর্দন করবে। তারা কোলাহল করতে থাকে এবং 'না না' বলে তাদের প্রতিবাদ জানায়। আইয়ুবকে দেখলাম যে তিনি হাসিমুখেই তাদের প্রতিবাদটা গ্রহণ করলেন এবং মাঝে মাঝে পরিহাস করলেন। সনদের সাইটেশনের পাঠ একটু পরিবর্তন করে বলতে লাগলেন, এই সনদের উপযুক্ত হবার জন্য তোমাদের ভদ্র আচরণ শিখতে হবে।

সমাবর্তন শেষে আইয়ুব চা-চক্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। প্রধানতঃ উপাচার্য, ডীন এবং সিণ্ডিকেট সদস্যরা তাঁর কাছে যেতে পেরেছিলেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার থাকায় আমরা সাধারণ শিক্ষকরা তাঁর কাছে যেতে পারিনি।

কিছুদিন যেতে না যেতেই মার্শাল ল' আমাদের গা-সহা হয়ে গেল। এরপরে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব নিজস্ব প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রে উত্তরণের একটি পদ্ধতি বের করলেন। 'বেসিক ডেমোক্র্যাসি' বা 'মৌলিক গণতন্ত্র' উদ্ভাবনার দায়িত্ব পুরোপুরি তাঁরই। তিনি সরাসরি পার্লামেন্টে জন প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি বাতিল করে গৌণভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেন, যাতে পার্লামেন্ট পুরোপুরি সরকারী শাসনের আওতায় থাকে। ধাপে ধাপে নির্বাচন এবং মনোনয়নের ব্যবস্থা ছিল গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মহকুমা পরিষদ—মহকুমা পরিষদ থেকে জেলা পরিষদ, অবশেষে জেলা পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচন—এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সরকার বিরোধিতা সমূলে উচ্ছেদের ব্যবস্থা নেয়া হয়। মৌলিক গণতন্ত্র কার্যকর করার পূর্বে বিখ্যাত ভারতীয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে আইয়ুবের বিস্তারিত আলোচনা হয়। এর কারণ, জয়প্রকাশ নারায়ণ 'পার্টিসিপেটরী ডেমোক্র্যাসি' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থের মধ্যে তিনি রাজনৈতিক দলভিত্তিক নির্বাচনকে অযৌক্তিক বলেন এবং বলেন যে, প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা করবে এবং পার্লামেন্টে তাদের নির্বাচন হবে ধাপে ধাপে। আইয়ুব জয় প্রকাশ নারায়ণের

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দর্শনকে গ্রহণ করেননি কিন্তু ধাপে ধাপে নির্বাচনের পদ্ধতি গ্রহণ করে বিধান সভাকে নিজের কুক্ষীগত করতে চেয়েছেন। মৌলিক গণতন্ত্রের ওপর জনসাধারণকে প্রশিক্ষিত করবার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের তরফ থেকে একটি টীম এসে আমাদেরকে মৌলিক গণতন্ত্রের মূল আদর্শটি জানিয়ে যায়। আলোচনা সভার আগে ডঃ মাহমুদ হোসেন আমাকে নিষেধ করেছিলেন—আলোচনাকালে আমি যেন কোনরকম প্রশ্ন না করি। তিনি বলেছিলেন, সরকার একটি সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে, সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবাদ যেন না হয় তার জন্য নানা জায়গায় সভার আয়োজন করছে। আমাদের এক্ষেত্রে কিছুই করণীয় নেই। আমরা শুধু শুনব, কিন্তু কোন মন্তব্য করব না। ইংরেজী বিভাগে একজন যুবক অধ্যাপক ছিলেন। ইনি পরে হায়দরাবাদের সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। আলোচনা সভায় ইনি একটা কথা বলেছিলেন। তাতে সরকারী বক্তা কিছুটা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন। মৌলিক গণতন্ত্রকে সর্বসাধারণের বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য করবার জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তার একটি হচ্ছে পাকিস্তানের লেখক ও শিল্পীদের প্রচারকার্যে নিযুক্ত করা। অর্থের লোভে আত্মবিক্রয় করার লোকের অভাব আমাদের দেশে কখনও হয় না, এক্ষেত্রেও হয়নি। কুদরতুল্লাহ সাহাব, জামিলউদ্দীন আলী এবং গোলাম আব্বাস প্রমুখ উর্দু লেখকের পরামর্শে লেখকদের ক্রয় করার ব্যবস্থা করা হয়। এই পর্যায়ে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে করাচীতে রাইটার্স গিল্ড বা লেখক সংঘ গঠন করা হয়। এর প্রাথমিক সদস্য হওয়ার জন্য আমার কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসেন, 'সাকী' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সাহেদ আহমদ দেহলভি এবং অন্য একজন প্রবীণ সাহিত্যিক রাজেলুন খায়েরী। এঁরা কিন্তু আমার উপর বিশেষ চাপ দেননি। বরঞ্চ আমি নিজের সিদ্ধান্ত যেন নিজেই নিই এই ইঙ্গিত করেছিলেন। আমি হাসিমুখে সরাসরি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। আমার প্রত্যাখ্যানে এই দুই প্রবীণ সাহিত্যিক ক্ষুণ্ন হননি, বরঞ্চ খুশিই হয়েছিলেন। এই দু'জন করাচী থাকাকালীন সময় সবসময় আমাকে সহযোগিতা করেছিলেন। এঁরা কেউ আর জীবিত নেই, কিন্তু এঁদের স্মৃতি আমার চিত্তে এখনও অমলিন রয়েছে।

বৃটিশ আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতেন। তবে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যের জন্য প্রার্থী হলে পদত্যাগ করতে হত। আমার এখন ঠিক মনে নেই আদৌ পদত্যাগ করতে হত কিনা, না পদত্যাগ না করেও সদস্যপদ রাখা যেত। তবে যাই হোক, আইয়ুবের আমলে ঘোষণা দেয়া হল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক রাজনীতিতে

www.pathagar.com

অংশগ্রহণ করতে পারবেন না এবং প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য পদপ্রার্থী হতে পারবেন না। এই নির্দেশনার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অধিকার খর্ব করা হয়। বৃটিশ আমলে আমরা যে স্বাতন্ত্র্য এবং অধিকার ভোগ করতাম তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হয়।

১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে সম্ভবত আনুষ্ঠানিকভাবে রাইটার্স গিল্ডের উদ্বোধন করা উদ্বোধন করা হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা অতীব আগ্রহে এইসব গিল্ডের সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রবীণ–নবীন সবাই ছিলেন। আমার সঙ্গে সবার সাক্ষাৎ হয়নি। কেননা আমি তখন 'আধুনিক বিশ্বে ইসলাম' এই নামে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করছিলাম। যাঁদের দেখেছিলাম তাঁরা হচ্ছেন ঃ ইব্রাহীম খাঁ, ডক্টর এনামুল হক, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্দিন, তালিম হোসেন, শওকত ওসমান, কবীর চৌধুরী, মুনির চৌধুরী এর বাইরেও অনেকে ছিলেন তাঁদের কথা আমি মনে করতে পারছি না। মোট ৩৫ জন ঢাকা থেকে এসেছিলেন। এঁদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। সাক্ষাৎকার ঘটিয়েছিলেন কুদরতুল্লাহ সাহাব এবং জামিলউদ্দিন আলী। এঁরা উভয়ই ছিলেন সরকারী আমলা। কুদরতুল্লাহ সাহাব সিএসপি অফিসার এবং সচিব ছিলেন। জামিলউদ্দিন আলী ছিলেন ইনকাম ট্যাক্সের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। এভাবে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় 'রাইটার্স গিল্ড' গড়ে ওঠে। ক্রমান্বয়ে আইয়ুবের গণতন্ত্র বিরোধী চক্রান্তে আমাদের লেখক গোষ্ঠী জড়িত হয়ে পড়েন এবং গোলাম মোস্তফা, জসীমুদ্দিন, নূরুল মোমেন, শওকত ওসমান এবং মুনীর চৌধুরী মৌলিক গণতন্ত্রের ওপর কবিতা লেখেন, প্রবন্ধ লেখেন, নাটক এবং গল্প লেখেন। এঁরা প্রত্যেকেই এ কাজের জন্য উচ্চহারে পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। এই রচনাগুলো পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং রেকর্ডপত্রে এগুলো এখনও বিদ্যমান আছে।

এসময় জনতার সাথে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য 'পাক জমহুরিয়াত' নামক এক বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়। সেই ট্রেনে গিল্ডের সদস্যদের কেউ কেউ আইয়ুবের সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। বাঙালী লেখকরা যারা এই সফরসঙ্গীর মধ্যে ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ শওকত ওসমান, মুনির চৌধুরী এবং গোলাম মোস্তফা। এভাবে ন্যাক্কারজনকভাবে আমাদের লেখকরা স্বৈরাচারী সরকারের কাছে আত্মবিক্রয় করেছিলেন। আমি এদের সঙ্গে সহযোগিতা করিনি বলে আমার বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দেয়া হয় এবং নানাভাবে আমাকে অপদস্ত করা হয়। সে সময় করাচীতে আমাকে একটি ত্রাসের মধ্যে বাস করতে হয়েছিল। আমাকে 'ভারতের দালাল' বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কোন বাংলা বই ছিল না। সে অভাব পূরণের জন্য আমি ভারতীয় দূতাবাসের কাছে কিছু বাংলা বই উপহার হিসেবে প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাই। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জামিলউদ্দিন আলী আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। দু'তিন মাস পর্যন্ত পুলিশের হয়রানীতে আমি প্রায় কাতর হয়ে পড়েছিলাম। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এরা কিছু করতে পারেনি।

১৯৬০ সালের ডিসেম্বরে আমি বাংলা একাডেমীর পরিচালক পদে যোগদান করি। এখানে যোগ দিয়ে আমি দেখি, একাডেমীর সীমানার মধ্যে গেটের কাছে একটি ঘরকে গিল্ডের ব্যবহারের জন্য দিয়ে রাখা হয়েছে। আমি এর প্রতিবাদ করি এবং কালক্রমে আ— চেষ্টায় গিল্ডের অফিস বাংলা একাডেমী থেকে সরে যায়।

বুদ্ধিমান এবং ন্যায়বান পাঠক অনুভব করতে পারবেন যে, আমি আইয়ুবের সঙ্গে কোন মুহূর্তেই স—যোগিতা করিনি, বরঞ্চ সহযোগিতা না করার জন্য আমাকে অপদস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা একাডেমীতে আমার অবস্থানের শেষ পর্যায়ে আইয়ুবের আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়। তখন আলতাফ গওহর পাকিস্তানের তথ্য সচিব। তিনি ঢাকার আদমজী গেস্ট হাউসে অবস্থান করছিলেন। সেখানে আমাকে তিনি ডেকে পাঠান। ওখানে গিয়ে দেখি ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, নূরুল মোমেন এবং মুনীর চৌধুরী আগে থেকেই বসে আছেন। আমি পৌঁছামাত্র আলতাফ গওহর আইয়ুবের টাইপ করা আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন এবং বাংলাতে এর অনুবাদের ব্যবস্থা করতে বললেন। অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেসের রিয়াজুল ইসলামও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ওখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, নূরুল মোমেন পাণ্ডুলিপিটির অনুবাদ করবেন এবং মুনীর চৌধুরী পরে সে অনুবাদ পরীক্ষা করে দেখবেন এবং বাংলা একাডেমীর পরিচালক হিসেবে আমি পাণ্ডুলিপিটি সাজিয়ে রিয়াজুল ইসলামের কাছে সমর্পণ করব। রিয়াজুল ইসলামের সঙ্গে নূরুল মোমেন ও মুনীর চৌধুরী একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তিতে অনুবাদ ও সংশোধনীর জন্য তাঁরা কত সম্মানী পাবেন তাও লিখিত ছিল। রিয়াজুল ইসলাম এখন আর জীবিত নেই। কিন্তু লণ্ডনে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি পূর্ণ প্রতাপে বিদ্যমান। আমার কথায় যদি কারও সংশয় থাকে তবে তাঁরা প্রেসের ফাইলপত্র ঘেঁটে সাক্ষ্য প্রমাণ বের করতে পারবেন। তাছাড়া আলতাফ গওহর এখনও জীবিত এবং লণ্ডনে বসবাস করছেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে যথার্থ সত্যটি উদঘাটিত হবে। মুদ্রিত গ্রন্থের গায়ে কোথাও আমার নাম অনুবাদক হিসেবে নেই, কিন্তু বাংলা একাডেমীর পরিচালক হিসেবে আমার তত্ত্বাবধানে বইটি মুদ্রণের ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করা হয়েছে এমন কথা লেখা আছে। বাংলা একাডেমী সরকারী নথিপত্র অনুবাদ এবং প্রকাশের ব্যবস্থা করত সে সময়। একই ধারার মধ্যে আইয়ুবের আত্মজীবনীটাও পড়ে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে যাঁরা মিথ্যার বেসাতী করেন তারা এই গ্রন্থের অনুবাদক হিসেবে আমাকে চিহ্নিত করে বসে আছেন। তাঁদের এই মিথ্যাচার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে একদিন নিশ্চয়ই উদঘাটিত হবে।

আমি প্রথমেই বলেছি আইয়ুবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, বরঞ্চ তাঁর অনেক কাজ-কর্মের বিরুদ্ধবাদী ছিলাম। আমি মিথ্যার সঙ্গে হাত মেলাইনি এবং জীবনে চিরকাল সত্যকে লালন করেছি। অথচ আমার নামে মিথ্যা রটনা করে মিথ্যাকেই সত্য হিসেবে পরিচিত করবার কত অপপ্রয়াস আমাদের দেশের কেউ কেউ করেছেন--এটা ভাবতেও আমার লজ্জা হয়।

যাঁরা অনুবাদ করেছিলেন তাঁরাও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অনুবাদ করেছিলেন এবং যে সময় অনুবাদ করেছিলেন সে সময় আইয়ুব খান পূর্ণ প্রতাপে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে তখন দেশব্যাপী কোন আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠেনি, সুতরাং যাঁরা অনুবাদ করলেন তাঁরা তাঁদের বিবেকের কাছে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হলে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে পূর্বতন সময়ের কর্মবিধির সমালোচনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। আর একটি মজার কথা হল এই যে, সেই সময় আইয়ুবের গ্রন্থটি পাকিস্তানের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সিলেবাসে রেফারেন্স বই হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।

আইয়ুবের শাসনের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সমগ্র পাকিস্তানে 'ডিকেইড অব রিফর্মস' নামক একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ উৎসব পালিত হয়েছিল। যাঁরা এ উৎসব পালন করেছিল তাঁদের সমালোচনা কেউ করেন না, কিন্তু আমার সমালোচনা করেন। যে আমি নগণ্যতমভাবেও আইয়ুবের কোন কর্মের অংশীদার ছিলাম না। ঘৃণা এবং বিদ্বেষের একটি বিকল মানসিকতায় যাঁরা আমাকে আক্রমণ করেছেন এবং এখনও করছেন বিপুলা কাল এবং নিরবধি পৃথ্বি প্রেক্ষাপটে একদিন না একদিন তাঁদের বিচার হবেই।

আমি যখন বাংলা একাডেমীর পরিচালক ছিলাম তখনও আইয়ুবের আত্মজীবনী প্রকাশনার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করা হয়নি। আইয়ুবের আত্মকাহিনী মূলত পরিকল্পিত হয়েছিল আলতাফ গওহর এবং নাজিমুদ্দীন হাশেম, পাকিস্তানের তথ্য মন্ত্রণালয়ের এই দুই প্রধান কর্মকর্তার দ্বারা। বাংলায় অনুবাদের পরিকল্পনা নাজিমুদ্দীন হাশেম করেন এবং সরকারী প্রশাসনের মাধ্যমে এই অনুবাদ কর্ম সম্পাদন এবং প্রকাশনার

www.pathagar.com

ব্যবস্থা করেন। সেই কারণে প্রশাসনিকভাবে যাঁরা এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন তাদের এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত কোন দায়িত্ব ছিল না। নূরুল মোমেন বাংলা অনুবাদ করে দিতেন, মুনীর চৌধুরী সে অনুবাদটি সংশোধন করতেন এবং আমি পাণ্ডুলিপি তৈরি করে রিয়াজুল ইসলামের হাতে দিতাম। প্রুফ সংশোধনের এক পর্যায়ে নাজিমুদ্দীন হাশেম পাণ্ডুলিপিটি আর একবার দেখতেন। যখন গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় তখন আমি আর বাংলা একাডেমীতে কার্যরত ছিলাম না, কিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশে আমার অংশত দায়-দায়িত্ব আমি অস্বীকার করছি না। পরিচ্ছন্ন এবং মুক্ত বিবেক নিয়ে আমি এ কথাগুলো লিখলাম।

www.pathagar.com

লিপি বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে

সম্ভবতঃ ১৯৩৫ সালের দিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সর্বভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য 'হিন্দী'কে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছিল। লিখন পদ্ধতি হিসেবে দেবনাগরী এবং ফারসী উভয় লিপির প্রচলনই সমর্থন করেছিল। যেহেতু মুসলমানরা উর্দু ভাষায় কথা বলতেন সেজন্য ফারসী লিপির সমর্থন করতে হয়েছিল। উর্দুর নামকরণ কংগ্রেস করেছিল 'হিন্দুস্থানী' বলে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সর্বভারতের জন্য গ্রহণযোগ্য লিপি হিসেবে রোমান হরফের কথা বলেছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের কথা চিন্তা করে এবং ভারতের বহুবিধ লিপির অবস্থান লক্ষ্য করে রোমান লিপির সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করেছিলেন। এ নিয়ে তিনি গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার পর 'হিন্দী' ভারতের রাষ্ট্রভাষা হয় এবং দেবনাগরী হরফ সাধারণভাবে ভারতের লিপি হিসেবে মর্যাদা পায়।

আধুনিককালে লিপির পরিবর্তনের প্রশ্নটি গৌণ হয়ে পড়েছে। এখন আমরা সর্বজনগ্রাহ্য লিপি ব্যবস্থাকে মান্য করতে শিখেছি। স্বাধীনতার সূত্রপাতে পাকিস্তান এবং ভারত উভয় দেশই লিপি নিয়ে চিন্তা ভাবনা আরম্ভ করেছিল। ভারতের জন্য সমস্যাটা তেমন জটিল হয়নি। ভারত সরকারীভাবে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গণ্য করেছিল, কিন্তু লিপির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। যার ফলে, ভারতের বিভিন্ন ভাষার জন্য বিভিন্ন লিপি বা বর্ণমালা কার্যকর রয়েছে। কোন এক ভাষার লিপি অন্য ভাষায় চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হয়নি। তাছাড়া, উত্তর ভারতে উর্দুর জন্য ফারসী বর্ণমালা এবং হিন্দীর জন্য দেবনাগরী বর্ণমালা এখনও চালু আছে। মধ্যযুগে আমরা দেখেছি, বিভিন্ন কাব্য দেবনাগরী এবং ফারসী উভয় বর্ণমালাতেই ধারণকৃত রয়েছে। মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত' কাব্যে ফারসী হরফের পাণ্ডুলিপি যেমন পাওয়া যায়, তেমনি দেবনাগরী বর্ণমালাও পাওয়া যায়। মধ্যযুগের সকল কাব্যের ক্ষেত্রে এই উক্তি প্রযোজ্য।

অতীতে এক সময় ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে এবং বিজয়ীদের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য লিপির পরিবর্তন করা হত। মধ্য এশিয়ায় তুখারিস্তান ছিল বৌদ্ধদের অঞ্চল। সে অঞ্চলের ধর্মীয় ভাষা ছিল

www.pathagar.com

পালি এবং স্থানীয় জনসাধারণের ভাষা ছিল তুর্কী। এসব ভাষা কোন্ হরফে লিখিত হত জানি না। সপ্তম-অষ্টম শতকে প্রতাপী আরব সেনারা যখন তুখারিস্তান দখল করে তখন বৌদ্ধরা প্রায় নির্মূল হয়ে যায় এবং অনেকে ভারতের দিকে চলে আসে। পালি ভাষার চর্চা তখন আর রইলো না। সাধারণ লোকের সঙ্গে অধিকারীর সংযোগসূত্র হিসেবে তুর্কী ভাষা বিদ্যমান রইল বটে, কিন্তু তার লিখন পদ্ধতির পরিবর্তন করা হল। সেখানে আরবী পদ্ধতি প্রবর্তিত হল। এভাবে বহু দেশে আরবী লিখন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছিল। সিন্ধু দেশে আরবদের আগমনের পর সিন্ধী ভাষা রইল বটে, কিন্তু আরবী লিপিতে তা লিখিত হতে লাগল। এখনও পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে আরবী লিপি ব্যবহৃত হয়। এভাবে মালয় ভাষাও আরবী হরফে লিখিত হয়েছিল। অধিকারী আরবরা ভাষার পরিবর্তন করেননি, কিন্তু লিপির পরিবর্তন করেছিলেন। তাছাড়া নবদীক্ষিত মুসলমানদের কোরআন শরীফ পাঠের জন্য আরবী লিপি শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল। এখন অবশ্য অধিকাংশ দেশেই আরবী লিপির পরিবর্তন হয়েছে, সেখানে শ্লাভনিক এবং রোমান লিপির প্রবর্তন হয়েছে। মধ্য এশিয়ায় আরবী লিপির পাশাপাশি শ্লাভনিক লিপির ব্যবহার চলছে, তুরস্কে রোমান লিপি ব্যবহার হচ্ছে, মালয় ভাষার জন্য রোমান হরফ গৃহীত হয়েছে। শুধুমাত্র সিন্ধী ভাষার জন্য এখনও আরবী হরফ রয়েছে। অবশ্য, তাদের ভাষার ধ্বনি বৈচিত্র্যকে তুলে ধরবার জন্য তারা নতুন বর্ণ লিপি উদ্ভাবন করেছে।

এগুলো সব অতীতের কথা। এখন আমরা হরফ পরিবর্তনের কথা বলি না। ভাষা পরিবর্তনের প্রশ্নই ওঠে না। তবু পাকিস্তানে এই পরিবর্তনের প্রশ্ন উঠেছিল, কিন্তু তা কখনই কোন আন্দোলনে রূপ নেয়নি। যাঁরা পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন, তাঁরা ছিলেন সরকারী কর্মকর্তা এবং সেক্ষেত্রে সরকার পক্ষের সকলেই যে পরিবর্তনের কথা বলছিলেন তা-ও নয়। আমি এখানে ভাষার কথা বলব না। লিপি সংক্রান্ত উদ্ভট প্রস্তাবনার কথাই তুলব।

তৎকালীন পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে আরবী লিপি প্রচলিত ছিল। সিন্ধী এবং উর্দু দুই-ই লিখিত হত আরবী বা ফারসী হরফে। পশতুও লিখিত হত আরবী হরফে। লোকভাষা হিসেবে পাঞ্জাবে কোন নির্দিষ্ট লিপি ছিল না। শিখরা গুরুমুখী হরফে পাঞ্জাবী লিখতেন এবং মুসলমান ফারসী হরফে। এক কথায়, পশ্চিম পাকিস্তানের সব ক'টি ভাষার জন্য একটি মাত্র বর্ণমালা ছিল এবং তা ছিল আরবী। সমগ্র পাকিস্তানের জন্য তখন ছিল—বাংলা ভাষার জন্য বাংলা হরফ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষার জন্য আরবী হরফ। এই হরফের পরিবর্তনের কথা সরকারীভাবে

www.pathagar.com

কখনও নির্দেশিত হয়নি। এ নিয়ে শুধু সরকারীভাবে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছিল।

এই আলোচনাটির সূত্রপাত করেছিলেন মরহুম ফজলুর রহমান। তিনি ঢাকার অধিবাসী ছিলেন, কোন ভাষায় তাঁর ভাল দখল ছিল না। এহেন ব্যক্তি আরবী হরফে বাংলা লিখবার একটি প্রস্তাব করেন। ফজলুর রহমান তখন পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৮ সালের জুন কি জুলাই মাসে তিনি ঢাকায় আসেন এবং ঢাকায় তাঁর বন্ধু মওলা মিয়ার বাসায় অবস্থান করেন। সেখানে একদিন তিনি আলোচনা বৈঠকের আয়োজন করেন। আলোচনায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন ঃ ফজলে আহমদ করিম ফজলী—তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব, ওসমান গণী—তিনি ছিলেন ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন, কবি জসীমউদ্‌দীন এবং আমি। সভায় পাকিস্তানের তথ্য দফতরের একজন কর্মকর্তা মোহাম্মদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রামের হুরুফুল কোরআন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এক বৃদ্ধ মৌলভী সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা জানতাম না, কেন আমাদের ডাকা হয়েছে। আলোচনার সূত্রপাতে ফজলুর রহমান সাহেব সভা আহবানের কারণ ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন, 'প্রচুর রক্তপাতের বিনিময়ে আমরা পাকিস্তান পেয়েছি, এই পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখা এবং বিপদ থেকে মুক্ত রাখা আমাদের কর্তব্য। যেহেতু ভারতবর্ষ থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি, সুতরাং ভারতের কাজ পাকিস্তানকে গ্রাস করা। পশ্চিম পাকিস্তান যেহেতু একটি বিরাট অঞ্চল তাই সেদিকে তাদের দৃষ্টি পড়বে না, তাদের দৃষ্টি পড়বে পূর্ব পাকিস্তানের উপর। তারা যে সৈন্য নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান দখল করবে তা নয়, তারা নিজেদের সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং সমাজের প্রভাব বলয়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে আনবার চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে বাংলাভাষা তাদেরকে বিরাট সাহায্য করবে। পশ্চিমবঙ্গের ভাষা বাংলা, আমাদের ভাষাও বাংলা। এই বাংলা ভাষার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ যত সহজে সম্ভবপর, অন্য কিছুতে তা সম্ভব নয়। আমাদের ভিন্ন ভাষা হলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু ভাষা যেহেতু অভিন্ন, সুতরাং ভাষার প্রকৃতি যদি আমরা পরিবর্তন করতে পারি, তাহলে অতি সহজে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিমবঙ্গের কবল থেকে রক্ষা করতে পারব। সেই জন্য আমার প্রস্তাব হচ্ছে, আমাদের বাংলা ভাষার লিখন পদ্ধতির আমরা পরিবর্তন ঘটাব। এই পরিবর্তন ঠিক মত করতে পারলে আমাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। আমি সেজন্য বাংলা ভাষার জন্য আরবী বর্ণমালার প্রবর্তন করতে চাই।'

www.pathagar.com

আমরা ফজলুর রহমানের এই বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। প্রস্তাবের অসারতা এবং অবাস্তবতা এত প্রকট ছিল যে, আমরা সকলেই কিছুক্ষণ পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে বসেছিলাম। আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে ফজলুর রহমান সাহেব চট্টগ্রামের হুরুফুল কোরআন সমিতির মৌলভী সাহেবকে আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন। মৌলভী সাহেব আরবী হরফে ছাপা একটি বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা আমাদের সামনে পেশ করলেন। তিনি বললেন যে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই পত্রিকাটিকে চালিয়ে আসছেন। বিভিন্ন মাদ্রাসায় এই পত্রিকার অনেক পাঠক আছে। মৌলভী সাহেবের পর ফজলুর রহমান সাহেব একটি তথ্য পেশ করলেন যে, এক সময় নাকি আরবী হরফে বাংলা লিখিত হত। কিছু পুরনো বাংলা পুঁথি পাওয়া গেছে যেগুলো আরবী হরফে লিখিত হয়েছে।

আলোচনা এই পর্যন্ত যখন এগিয়েছে তখন শহীদুল্লাহ্ সাহেব সভায় প্রবেশ করলেন। এ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তা সংক্ষেপে তাঁকে বোঝানো হল। সব কথা শুনে শহীদুল্লাহ সাহেব মন্তব্য করলেন, 'ভাষাবিদ হিসেবে আমার বক্তব্য হচ্ছে, বাংলা বর্ণমালা পৃথিবীর সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন এবং ধ্বনিসঙ্গত বর্ণমালা। অন্য কোন বর্ণমালার দ্বারা বাংলা ভাষার ধ্বনিকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যায় না। যেহেতু এ বর্ণমালা ত্রুটিপূর্ণ নয়, সুতরাং এর পরিবর্তন করার কোন যুক্তি নেই। দ্বিতীয়তঃ অনেক ধ্বনি আরবী বর্ণমালার সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। ফারসী ভাষায় আরবী বর্ণমালা গ্রহণ করা হয়েছে সত্য, কিন্তু সংশোধন করে গ্রহণ করতে হয়েছে। কয়েকটি ধ্বনির জন্য বাধ্য হয়ে ফারসীতে পে, চে ইত্যাদি বর্ণলিপির উদ্ভাবন করতে হয়েছে।

পাকিস্তান শব্দটি আরবীতে লেখা যায় না, লেখা হয় 'বাকিস্তান'। এটুকু বলে তিনি চট্টগ্রামের মৌলভী সাহেবের 'হুরুফুল কোরআন' পত্রিকার একটি সংখ্যা হাতে তুলে নিলেন। কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে বললেন, 'এখানে সব শব্দ ভুল লেখা হয়েছে। বিশ্বাসকে লেখা হয়েছে 'বে শিন তাসদীদ আলিফ এবং শিন' দিয়ে—এটা বাংলাতে লিখলে দাঁড়ায় 'বিশ্‌শাশ'। অর্থাৎ বাংলা 'বিশ্বাস' শব্দের বানানটি আরবীতে তিনি ভুলতে পারেন নি।' জনাব ফজলুর রহমান তখন বললেন, 'আরবী বর্ণমালার কি কি সংশোধন প্রয়োজন, তা–কি আপনি করে দিতে পারবেন?' শহীদুল্লাহ সাহেব বললেন, 'ভাষাবিদ হিসেবে আমি ত্রুটিগুলো দেখিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আরবী হরফে লেখা আমি সমর্থন করি না।' এ সময় কবি জসীমউদ্‌দীন বলে উঠলেন, 'আমার কবিতার বই

www.pathagar.com

কলকাতায় বেশ চলে, আরবী হরফে লিখলে আমার বই আর সেদেশে চলবে না। তাছাড়া আরবী হরফে আমার ছন্দও ঠিক রাখা যাবে না।'

এ নিয়ে সেদিন আর বিশেষ আলোচনা হয়নি। আমি কোন কথা বলিনি। প্রস্তাবের অন্তঃসারশূন্যতা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। এটা যে কোনদিনই বাস্তবায়িত হতে পারে না—এটা কল্পনা করা কারও পক্ষে অসম্ভব ছিল না। একমাত্র ওসমান গণি সাহেব রোমান হরফের পক্ষে কিছু বলবার চেষ্টা করেছিলেন। এ আলোচনার আর অগ্রগতি হয় নি। কিন্তু কিছুদিন পর পাকিস্তান ইতিহাস সম্মেলনে এ বিষয়টি আবার নতুন করে উত্থাপিত হয়। এই সম্মেলনে ফজলুর রহমান সভাপতি ছিলেন। বিখ্যাত ভারতীয় আলেম এবং পণ্ডিত হযরত সৈয়দ সুলায়মান নাদভী প্রধান অতিথি ছিলেন। প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে অনেক আপত্তিকর কথা ছিল। তিনি বাংলা হরফের বিরুদ্ধে কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, 'বাংলা হরফের সঙ্গে হিন্দুদের দেবীর নামের যোগ আছে। সুতরাং এই হরফ পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয়।' সকাল বেলা কার্জন হলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শেষে শহীদুল্লাহ সাহেব সাংবাদিকদের কাছে নাদভী সাহেবের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান। ইতিমধ্যে নাদভী সাহেবের বক্তব্যের কথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মহলে প্রচার হয়। বিকেল তিনটার সময় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে নাদভী সাহেবের গাড়ি যখন কার্জন হলে প্রবেশ করছে তখন একদল ছাত্র গাড়ি ঘিরে ফেলে এবং নাদভী সাহেবকে গাড়ি থেকে টেনে-হিঁচড়ে মাটিতে নামিয়ে আনে। ছাত্রদের চাপে নাদভী সাহেব তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করেন। সন্ধ্যার পর কবি জসীমউদ্‌দীনের ফুলবাড়িয়ার বাসায় ফজলুর রহমান সাহেব আসেন। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রক্টর মযহারুল হক ছিলেন, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক ছিলেন, অধ্যাপক সফিউল্লাহ ছিলেন, আমিও ছিলাম। ফজলুর রহমান সাহেব সুলায়মান নাদভীর অসম্মানের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং সেজন্যে প্রক্টর মযহারুল হককে দায়ী করেন। ঘটনাটি এখানেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ফজলুর রহমানের জন্য শেষ হল না। করাচী পৌঁছে আরবী বর্ণমালার সংশোধনের প্রস্তাব দিয়ে সরকারীভাবে শহীদুল্লাহ সাহেবকে একটি পত্র দেন। এই পত্রটি কি করে যেন কলকাতার 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ছাপা হয় এবং পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে সমালোচনা করা হয়। তখন পাকিস্তান সরকার 'শিক্ষা উপদেষ্টা কাউন্সিল' বলে একটি কাউন্সিল গঠন করেছিল। সে বছরই সম্ভবতঃ নভেম্বর মাসে উক্ত কাউন্সিলের বৈঠক ঢাকায় বসেছিল। বিকেল বেলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডঃ সৈয়দ মোয়াজ্জেম

www.pathagar.com

হোসেনের বাসগৃহে একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা ডঃ মাহমুদ হাসান ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেবকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তাঁর শেরওয়ানীর কলার চেপে ধরে তাঁকে 'দেশদ্রোহী' বলে আখ্যায়িত করেন। 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের জন্য শহীদুল্লাহ সাহেবকে দোষী সাব্যস্ত করেই এই অভিযোগ করা হয়।

চট্টগ্রামের হুরুফুল কোরআন সোসাইটির মৌলভী সাহেবের নাম এখন আমার পড়ছে, তাঁর নাম ছিল মৌলভী জুলফিকার। তাঁকে সরকারী ভাতা দেয়া হতে থাকে এবং আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে এককালীন কিছু টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জনসাধারণের সঙ্গে ফজলুর রহমানের কোন সংযোগ ছিল না। তাঁর একটি মূর্খতা এবং গোঁয়ার্তুমি ছিল। তাঁর বোঝা উচিত ছিল, কেউ তাঁকে সমর্থন করছে না, পাকিস্তান সরকারের অন্য কোন মন্ত্রী তাকে সমর্থন করে কোনও বিবৃতি দেননি। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে ফজলুর রহমান অব্যাহতি পেয়েছেন এবং তাঁকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

আরবী হরফে বাংলা লেখার এই অপচেষ্টা বিশেষভাবে দানা বাঁধতে পারেনি। তবে কবি গোলাম মোস্তফা তার 'নওবাহার' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'আরবী বর্ণমালা সকল বর্ণমালার জননী' বলে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন। এই প্রবন্ধও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। গোলাম মোস্তফা অবশ্য আরবী হরফে বাংলা লেখার কথা বলেন নি, আরবী হরফের গুণগান করেছিলেন মাত্র।

আরবী বর্ণমালার সাহায্যে বাংলা লিখবার বিকল্প চেষ্টা শুরুতেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ নিয়ে পরে আর কেউ উচ্চবাচ্য করেন নি। কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে আমাকে লাঞ্ছিত এবং অপমান করবার জন্য কেউ কেউ মিথ্যা বলে থাকেন যে, আমি নাকি এককালে আরবী বর্ণমালার সমর্থক ছিলাম। আমার সাহিত্যকর্ম সকলের কাছেই উন্মুক্ত এবং সুস্পষ্ট। আমার বিভিন্ন অভিভাষণের কথা সকলেই জানেন। আমার কোন লেখা থেকে অথবা কোন উক্তি থেকে এ পর্যন্ত কেউ প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন নি যে, আমি আরবী হরফে বাংলা লেখার সমর্থন করেছিলাম। দুর্বৃত্তের চাতুরীর অভাব হয় না। সুতরাং, যাঁরা দুর্বৃত্ত তারা মিথ্যাকে বারবার উচ্চারণ করে সত্যকে আড়াল করতে চায়। আমি সত্যকে আড়াল করতে চাই না। জীবনে কোন মুহূর্তে মিথ্যার বেসাতি আমি করিনি। যারা নির্ভেজাল মিথ্যাচারী তাদের বিকারগ্রস্ততার জন্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের জাতির আজ অসহায়

www.pathagar.com

অবস্থা। সত্যকে উপস্থাপন করার মাধ্যমে এই অসহায় অবস্থা দূর করা সম্ভব।

পাকিস্তানের সূত্রপাতে আরবী ভাষার প্রয়োগ নিয়ে কিছু বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল আগা খানের বিবৃতি। 'পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হবে' এই ঘোষণা শুনে আগা খান বলেছিলেন যে ইসলামিক রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন ইসলামী ভাষা অর্থাৎ আরবী। আগা খানের বিবৃতি তখন অনেকেই সমর্থন করেছিলেন। ডঃ শহীদুল্লাহও সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু এটা কোন আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় নি। আরবীর সপক্ষে এ সমস্ত বিবৃতির কোন প্রতিবাদও তখন কেউ করেনি। সকলে ধরে নিয়েছিল, এটা নেহায়েতই একটি স্বপ্ন-বিভ্রম। এ নিয়ে আলোচনা করা নিরর্থক।

লিপি পরিবর্তন যখন কোনক্রমেই গৃহীত হল না এবং 'অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া' বলে বর্জিত হল তখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের প্রস্তাব করলেন। মওলানা আকরম খাঁ-কে সভাপতি করে বর্ণমালা সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। এই সংস্কার কমিটিতে ছিলেন— অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, আবুল হাসনাত, ওসমান গণি। যদ্দুর মনে পড়ে, ডঃ শহীদুল্লাহকে এই কমিটিতে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে মতদ্বৈধতা সৃষ্টি হওয়ায় তিনি এই কমিটিতে কাজ করেন নি। এই কমিটির রিপোর্ট কার্যকর হয় নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফাইলবন্দী হয়ে শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গিয়েছে। দেখা গেল যে, বাংলা বর্ণমালার সংস্কারের প্রয়োজন থাকলেও কেউ এর সংস্কারের পক্ষপাতি নয়। যেহেতু লিপিকরণ প্রথা যেভাবে চলে আসছে তা জনসাধারণ সহজেই মান্য করে রেখেছে, তাই পরিবর্তনের কথা কেউ ভাবতে চায়নি। অনেক পরে, বাংলা একাডেমী বানান সংস্কার নিয়ে একটি একাডেমিক এক্সারসাইজ করেছিল, কিন্তু তা কার্যকর করার কথা তারা ভাবেনি।

কতকগুলো কারণে আরবী হরফে বাংলা লেখা একটি হাস্যকর উদ্যোগে পর্যবসিত হয়েছিল। প্রথম কথা হচ্ছে, এটা ছিল মরহুম ফজলুর রহমানের মস্তিষ্কপ্রসূত একটি শিশু এবং ফজলুর রহমানের মস্তিষ্কে সারবস্তু কিছু আছে কিনা তা নিয়ে সকলের সংশয় ছিল। দ্বিতীয়তঃ ফজলুর রহমানের এই প্রস্তাবনায় পাকিস্তান সরকার মৌন ছিল—প্রকাশ্যে সমর্থনও করেনি, বিরোধিতাও করেনি। তিনি একা একা এ নিয়ে বেশ কিছু লম্ফ-ঝম্ফ করেছিলেন, কিন্তু কোনরূপ কার্যকর ভূমিকা নির্মাণ করতে সক্ষম হননি। এ আন্দোলনটি চালু রাখবার জন্য কয়েকজন অবাঙালীকে তিনি নিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তারা এই কাজের পিছনে কোন উদ্যম

www.pathagar.com

প্রয়োগ করতে পারেননি। যাদের ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন তারা হচ্ছেন ঃ মওলানা আবদুর রহমান বেখুদ, ফজলে আহমদ করিম ফজলী এবং ডঃ আনদালিব শাদানী। এরা মাঝে মাঝে বৈঠকে মিলিত হতেন, কিছু ভাতা পেতেন এবং সরকারী পয়সায় চা পান করতেন। এ ব্যাপারে মওলানা বেখুদ অনেক পরে আমার কাছে একদিন গল্প করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'দেখুন, আমরা জানতাম যে এগুলো করে কিছু হবে না, তবু কিছু অর্থ লাভের বিনিময়ে ফজলুর রহমানের খামখেয়ালীতে যোগ দিয়েছিলাম।'

বাংলা ভাষা বিস্ময়করভাবে সজীব এবং বাংলা লিপির প্রচলনও আনন্দিতরূপে সর্বজনগ্রাহ্য। তাই কোন প্রতিবন্ধকতাই এই ভাষা ও লিপির অগ্রযাত্রাকে রুদ্ধ করতে পারেনি। লিপির পরিবর্তনের পরিকল্পনা হাস্যকরভাবে হারিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ভাষার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রাণ দিতে হয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমরা আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রবল প্রতিবাদ করেছিলাম এবং অশুভ শক্তি আমাদের প্রতিবাদের সম্মুখে সংকটাপন্ন হয়েছিল। সেই ভাষা আন্দোলন পরবর্তীতে জাতির অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে পরিণত হয় এবং স্বাধীনতার যাত্রাপথকে উন্মুক্ত করে।

www.pathagar.com

একুশে ফেব্রুয়ারী

মানুষের একটি স্বভাব আছে, যে কোন ঘটনাই ঘটুক, তাৎক্ষণিকভাবে তার বিচার করতে বসা। কোন একটি আন্দোলন যখন চরম আকার ধারণ করে তখন সেই চরম কুশীলবগণের কথাই তারা ভাবে। অর্থাৎ একটি আন্দোলনের চূড়ান্ত অভিব্যক্তির সময় যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের কথাই ভাবে। চূড়ান্ত অভিব্যক্তির সময় যারা জড়িত থাকেন, দেখা যায় যে তারা আকস্মিকভাবে জড়িত হয়েছেন, আন্দোলনের সামগ্রিক গতিধারার সঙ্গে হয়তো তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই বলে আমি যাঁরা আকস্মিকভাবে জড়িত হন তাঁদের অবমূল্যায়ন করছি না।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আমরা পর্যালোচনা করি না। আমরা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যারা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁদের কথাই শুধু উল্লেখ করি। এ আন্দোলনের পিছনে একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে।

বৃটিশ আমলে ভাষা নিয়ে কোন সমস্যা ছিল না, কোন আন্দোলনও হয়নি। বাংলাদেশ অঞ্চলে স্কুলে এবং কলেজে বাংলা ভাষার বিকল্প হিসেবে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন ছিল। তখন এ নিয়ে কেউ তর্ক করেনি। আমি যখন আরমানিটোলা স্কুলে ১৯৩২ সালে ভর্তি হই তখন মাতৃভাষা হিসেবে আমাকে উর্দু নিতে হয়েছিল। উর্দু আমি বাড়িতে পড়েছিলাম, ফার্সীও পড়েছিলাম। বাবা ভেবেছিলেন যে, বাংলার চেয়ে উর্দুতে আমি বেশি নম্বর পাব। তাই আমাকে উর্দু নিতে বাধ্য করেছিলেন। আমি কিন্তু ভর্তির তিন মাসের মধ্যেই উর্দু বাদ দিয়ে বাংলার ক্লাস করতে থাকি। আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কোন কোন পরিবারে উর্দু প্রচলিত ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারে উর্দু গুরুত্ব পায়নি। বৃটিশ আমলে উর্দু ও বাংলা নিয়ে কোন বিতর্ক ছিল না। খুবই নগণ্যসংখ্যক লোক উর্দু ভাষায় কথা বলত এবং তাদের পাঠক্রমেও উর্দু ছিল।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর এদেশে উর্দু প্রচলনে প্রথম সরকারী প্রচেষ্টা দেখা যায়। ঢাকায় উর্দু মাধ্যম স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে যেখানে আরবী, ফার্সী অথবা সংস্কৃত ছিল, সেখানে উর্দুর অনুপ্রবেশ ঘটে। তাছাড়া বাংলার সঙ্গে উর্দুকে একটি আবশ্যিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করবার

www.pathagar.com

পরিকল্পনা চলতে থাকে। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে কিন্তু উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে আবশ্যিক করবার কোন পরিকল্পনা ছিল না। কারণস্বরূপ সরকারী যুক্তি ছিল যে পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু ছাড়াও কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষা আছে যেমন সিন্ধী, পশ্তু, পাঞ্জাবী ইত্যাদি। এর সঙ্গে বাংলা জুড়ে দিলে প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে তিনটি ভাষা শিখতে হয়। অবশ্য পাকিস্তান সরকার করাচীতে বাংলা মাধ্যমে একটি স্কুল করেছিলেন।

এরপর রাজনৈতিকভাবে উর্দুকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা চলতে থাকে। ১৯৪৮ সালে জিন্নাহ সাহেব যখন ঢাকায় আসেন তখন রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি প্রথম উত্থিত হয় জিন্নাহ সাহেবের একটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে। ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে অর্থাৎ বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একটি জনসভায় জিন্নাহ সাহেব প্রথম ঘোষণা দেন যে, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কেন যে তিনি এই ঘোষণা দিলেন সেই সময় —এটা আজও আমার চিন্তার বাইরে।

জিন্নাহ সাহেব যখন ঢাকায় আসেন তখন আমি রেডিও পাকিস্তানে চাকরি করি। বেতার মাধ্যমে তাঁর ঢাকায় আগমনকে সরাসরি সম্প্রচার করবার জন্য যারা নিযুক্ত হন তার মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আমি এবং নাজির আহমদ বাংলাতে ঘোষণা দেব কথা ছিল এবং উর্দুতে ঘোষণা দেবার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিলেন ইসরাত রহমানী এবং কলিমুল্লাহ। বিমানবন্দরে উপরের আকাশে যখন হালকা নীল রং-এর বিমানটি দেখা গেল, তখন থেকেই আমরা ঘোষণা আরম্ভ করলাম। আমরা প্রত্যেকেই অপরিসীম উৎসাহে এই ঘোষণার দায়িত্ব পালন করেছি। জিন্নাহ সাহেব তখন আমাদের চিন্তা, বিশ্বাস এবং অবলম্বনের প্রতিনিধি। এদেশের সকল মানুষ জিন্নাহ সাহেবকে এমন একটি উঁচু আসনে স্থান দিয়েছিল যার তাৎপর্য এখনকার মানুষের কাছে বোঝানো যাবে না। একটি বিরাট সংকল্পের বাস্তব উপলব্ধি এবং প্রকাশ হিসেবে আমরা তখন পাকিস্তান পেয়েছিলাম। আমাদের এই সংকল্পের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জিন্নাহ সাহেব—আমাদের অবিসংবাদিত নেতা। সুতরাং এই নেতার আগমনে দেশের জনগণ হর্ষোৎফুল্ল হবে এটাই স্বাভাবিক। বিমানবন্দরে অবিশ্বাস্য ভিড় হয়েছিল জনতার। এদেশে যে সংবর্ধনা এবং সর্বস্তরের মানুষের যে শুভেচ্ছা তিনি পেয়েছিলেন—তাঁর একটি উক্তিতে তা চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে গেল। আমাদের মনে হতাশা জাগল। আকস্মিকভাবে আমাদের মনে হল —তিনি তো আমাদের নন, তিনি তো পশ্চিম পাকিস্তানের।

অথচ মজার ব্যাপার, এই জিন্নাহ সাহেবের ভাষা উর্দু ছিল না। তিনি ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং তাঁর প্রতিদিনের ব্যবহারিক ভাষা

www.pathagar.com

ছিল ইংরেজী। এক সময় যখন তিনি ইংল্যাণ্ডে ছিলেন, তখন শেক্সপীয়ারের নাটকে অভিনয় করতেন। তাঁর রুচি, মানসিকতা, চিন্তাধারা ছিল ইংরেজদের মত। সুতরাং নতুন দেশের অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর কোন প্রকার জ্ঞানই ছিল না। তিনি পাকিস্তানের ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, নৃত্য এবং সঙ্গীত সম্পর্কে কোন সংবাদই সম্ভবত রাখতেন না। তাঁর সম্পর্কে যত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে এবং যে সমস্ত জীবনী প্রকাশিত হয়েছে সে সবের মধ্যে কোথাও এ উপমহাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। সুতরাং উর্দু নিয়ে অকস্মাৎ তাঁর চিন্তা ভাবনা আমাদেরকে বিস্মিত করে। তিনি কি জানতেন যে বাংলাদেশের মানুষের ভাষা বাংলা এবং এ অঞ্চলের সংস্কৃতির একটি নিজস্ব দিগ্‌বলয় আছে? আমার মনে হয়, তিনি জানতেন না। পাকিস্তানের অবাঙালী কর্মকর্তারা তাঁকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছিল এবং তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে পাকিস্তান ধ্বংসের বীজ বপন করেছিলেন।

রেসকোর্স ময়দানে কারা হাত নেড়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল তা আমি জানি না, কেউ জানে বলে আমি বিশ্বাস করি না। একগুচ্ছ মানুষ মাঠের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে হাত নেড়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল—তা দেখেছিলাম। তারা সাধারণ জনতার একাংশ হতে পারে অথবা ছাত্রও হতে পারে। সে সময় এ রহস্য উন্মোচিত হয়নি। পরবর্তীতে অনেকে দাবী নিয়ে এসেছেন যে তিনি এবং তার কয়েকজন সঙ্গী এই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এগুলোর কোন প্রমাণ নেই। লাউড স্পীকারে শব্দ শোনা যাচ্ছিল না আজিজ আহমদের এই মন্তব্য আমার কাছে সত্য বলে মনে হয়নি। আমার বিশ্বাস, হাত নাড়াটা একটি প্রতিবাদ ছিল এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে জিন্নাহ সাহেব যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেখানকার প্রতিবাদটা ছিল সুস্পষ্ট। তিনি সেখানে দ্বিতীয়বার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তখন পিছনের সারি থেকে সুস্পষ্টভাবে 'না, না' ধ্বনি উঠেছিল। আমার জানা মতে, এ কে এম আহসান এই সাহসী প্রতিবাদটি করেছিলেন। সে সময়ই ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের মধ্যে আহসানের নামটি উচ্চারিত হয়েছিল।

এর পরের ঘটনাটি আমি মরহুম কামরুদ্দিন সাহেবের কাছে শুনেছিলাম। কামরুদ্দিন সাহেব আরমানিটোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে ঢুকেছিলেন ১৯৩৮ সালে। তিনি আমার সরাসরি শিক্ষক না হলেও তাঁকে চিরকাল শিক্ষকের মর্যাদা দিয়ে এসেছি। মুসলিম লীগের একজন বলিষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে তিনি জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন যেদিন কার্জন হলে বক্তৃতা হয় সেদিন বিকেলে। জিন্নাহ

www.pathagar.com

সাহেব নাকি ছাত্রদের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন, 'আমার ছেলেরা প্রকাশ্য সভায় আমার বক্তব্যের প্রতিবাদ করবে এটা আমি কল্পনা করতে পারিনি। তারা তো আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার কাছে ক্ষোভ জানাতে পারত। একটি নতুন দেশের জীবনে এই ধরনের প্রতিবাদ ইনডিসিপ্লিন সৃষ্টি করবে।'

জিন্নাহ্ যে ক'দিন ঢাকা ও চট্টগ্রামে ছিলেন রেডিও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আমি এবং জয়নুল আবেদীন তার কাছাকাছি ছিলাম। সুতরাং তার আচরণ, সাধারণ স্বভাব, বিরক্তি, হতাশা এবং আনন্দ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন—এতে কোনই সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি একক প্রচেষ্টায় একটি উপমহাদেশের মানচিত্র পাল্টিয়ে দিতে পারেন, তাকে যে নামেই অভিহিত করা হোক, তিনি যে অনন্যসাধারণ ছিলেন সে ব্যাপারে কারুরই সন্দেহ থাকবার কথা নয়। চট্টগ্রামে তিনি যখন বক্তৃতা করছিলেন তখন দূরের পাহাড়গুলো তাঁর শব্দগুলোর প্রতিধ্বনি ফিরিয়ে দিচ্ছিল। তিনি স্মিত মুখে এই প্রতিধ্বনির সাড়া উপভোগ করেছিলেন, লক্ষ্য করছিলাম।

জিন্নাহ্ সাহেব চলে যাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ লিয়াকত আলীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিল এবং ২১ দফা একটি দাবীপত্র পেশ করেছিল। বর্তমানের অধ্যাপক গোলাম আযম তখন ছাত্র সংসদের জিএস ছিলেন। সভাটা বসেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমন্যাস্টিক কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে। বর্তমানে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামে পরিণত হয়েছে। দাবীপত্রের মধ্যে সেনাবাহিনীতে সংখ্যানুপাতে বাঙালীদের নিয়োগ সম্পর্কে কথা ছিল। প্রশাসনিক কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে সংখ্যা অনুপাতে বাঙালীদের নিয়োগের দাবী ছিল, চট্টগ্রামে সেনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনার কথা ছিল এবং আরও অনেক কিছু ছিল। প্রধানমন্ত্রী এই দাবীনামা পেয়ে অসম্ভব রুষ্ট হন এবং এটাকে আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট বলে অভিহিত করেন। যা-ই হোক, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম অবস্থানকালে লিয়াকত আলী খান রাষ্ট্রভাষা নিয়ে কোনরূপ মন্তব্য করেননি।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এভাবেই ক্রমশঃ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দানা বাঁধতে থাকে। ঢাকায় তত্ত্বগতভাবে এই প্রতিবাদকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যা বিভাগের একজন প্রভাষক। আবুল কাসেম অত্যন্ত দূরদর্শী এবং চিন্তাশীল পুরুষ ছিলেন। সর্বপ্রকার সংগঠনকর্মে তার দূরদর্শীতা, শৃঙ্খলা এবং কর্মদক্ষতা অসাধারণ ছিল। তিনি কয়েকজন ছাত্র-কর্মী নিয়ে তমদ্দুন

www.pathagar.com

মজলিশ গঠন করেন। এই তমদ্দুন মজলিশের ব্যাপক অনুষ্ঠানসূচী থাকলেও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। ততদিনে আমি রেডিও পাকিস্তান ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগ দিয়েছি। তখন ১৯৪৯ এর শেষ। অধ্যাপক আবুল কাসেম তাঁর কর্মপন্থা নির্ধারণের প্রশ্নে দেশের প্রবীণ সাহিত্যসেবী এবং পণ্ডিতদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনায় বসতেন। তাঁর এসব আলোচনা সভায় ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল হাশেম, ইব্রাহীম খাঁ—এঁরা উপস্থিত থাকতেন। একটি সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম মনে আছে। বাংলাদেশের আবুল কাসেমই প্রথম ব্যক্তি যিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর পাশাপাশি বাংলার কথা উচ্চারণ করেছিলেন। সেই সময়কালে আমার ছাত্রদের মধ্যে দুই জন কাসেম সাহেবের কর্মী হিসেবে কাজ করত। তারা হচ্ছে আশরাফ ফারুকী এবং আবদুল গফুর। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় আন্দোলনেরও কর্মপন্থা তমদ্দুন মজলিশ গ্রহণ করেছিল। তারা ধর্মীয় আন্দোলনের অংশ হিসেবে বছরে একদিন 'ওমর দিবস' পালন করত। ইসলামের ইতিহাসে হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন একজন আদর্শ শাসক, বিপ্লবী এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন ত্যাগী পুরুষ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব সময় তাঁর প্রতিবাদ ছিল প্রখর। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তিনি কখনও মান্য করতেন না। তাঁর দৃষ্টিতে মানবিক প্রয়োজনের দিক থেকে দাস এবং সম্রাট ছিল সমপর্যায়ের। হযরত ওমরের (রাঃ) স্মরণে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তমদ্দুন মজলিশ আমাদের দেশে একটি নতুন আবেগের সঞ্চার করে।

তমদ্দুন মজলিশ রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে নিজেকে ক্রমশঃ জড়িয়ে ফেলছিল। কমিউনিজমের মোহগ্রস্ততা থেকে আমাদের দেশের তরুণদের রক্ষা করবার জন্য মজলিশ কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করে। তার মধ্যে একটি ছিল এটা প্রমাণ করা যে, ইসলামের মধ্যেই সমাজতন্ত্রের যথার্থতা নিহিত আছে হযরত আবু জর গিফারীকে নিয়ে তমদ্দুন মজলিশ আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। আবু জর গিফারী ছিলেন একজন যথার্থ বিপ্লবী পুরুষ। রসূলে খোদার (সাঃ) সাহাবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন ত্যাগী, নিষ্ঠাবান এবং সাম্যবাদী আদর্শ পুরুষ।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তমদ্দুন মজলিশের ছিল প্রধান তত্ত্বগত ভূমিকা। তত্ত্বগত এ কারণে বললাম যে এই প্রতিষ্ঠানটিই সর্বপ্রথম লিখিতভাবে, যুক্তির সাহায্যে বাংলার সপক্ষে বক্তব্য তুলে ধরে। জনসংখ্যার অধিকারে তমদ্দুন মজলিশ বাংলাকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা কখনও বলেনি। এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলা এবং উর্দুকে সম মর্যাদায় পাশাপাশি অবস্থানের দাবী জানিয়েছিল। তখন সামগ্রিকভাবে এ দাবীটি কোন প্রকার

www.pathagar.com

আন্দোলনে রূপ নেয়নি এবং কাসেম সাহেবও কোন প্রকার সংঘর্ষ এবং প্রকাশ্য আন্দোলনের পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন যে সমগ্র দেশে যেন বাংলা ভাষার পক্ষে একটি বিশ্বস্ততা গড়ে উঠে।

কাসেম সাহেব চেয়েছিলেন যেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ তার প্রস্তাবে প্রকাশ্য সমর্থন জানায়। তিনি এ ব্যাপারে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-র সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু এটা সম্ভবপর হয়নি একটি কারণে। তখন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন গনেশচরণ বসু এবং অধ্যাপকদের মধ্যে আর দু'জন হিন্দু ছিলেন—বিশ্বরঞ্জন ভাদুরী এবং হরনাথ পাল। এঁরা রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক কোন বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে চাননি। গনেশ বাবু স্পষ্টই বলেছিলেন, 'আমার জীবনযাত্রা ব্যাহত হোক এমন কোন কর্মকান্ডে আমি জড়িত হতে চাই না এবং বিভাগের পক্ষ থেকে কেউ এই বিতর্কে অংশ নিক, তা আমার কাম্য নয়।' আমরা তার যুক্তি মেনে নিয়েছিলাম। শহীদুল্লাহ সাহেব ব্যক্তিগতভাবে তমদ্দুন মজলিশের কর্মকান্ডকে সমর্থন করতেন এবং মজলিশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন।

সে সময় অপর এক ব্যক্তি বাংলাকে উর্দুর সঙ্গে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করবার পক্ষে নীরব আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি আবুল হাসনাত এম ইসমাইল। তিনি ছিলেন পুলিশের ডিআইজি এবং আমার অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তি। আবুল হাসনাত সাহেব সাহিত্যিক ছিলেন এবং এক সময় তাঁর লেখা গল্প 'প্রবাসী' এবং 'বিচিত্রা'য় ছাপা হয়েছিল। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁর গল্পটির নাম আমার মনে আছে 'লাভ স্টোরি'। এটি একটি রম্য গল্প, বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। বিচিত্রার গল্পটির নাম 'অচল সিকি'। তবে তিনি উভয় বঙ্গে বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর যৌন তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের জন্য। আবুল হাসনাত সাহেব সর্বদাই সাহিত্যিক এবং সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে বসবাস করতে ভালবাসতেন। তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার সপক্ষে বুদ্ধিজীবী এবং বিভিন্ন পেশাজীবী লোকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে সরকারের নিকট একটি আবেদন পেশ করেছিলেন। এই আবেদনপত্রে আমিও স্বাক্ষর করেছিলাম। তিনি একটি সাহিত্য সমিতি গঠন করেছিলেন যার আহবায়ক হিসেবে আমি অনেকদিন কাজ করেছি। এই সমিতির সভায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ করা হত এবং আলোচনা করা হত। তবে প্রায়ই পাকিস্তানে বাংলা ভাষার ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা হত। সভা বসত কখনও আবুল হাসনাত সাহেবের বাসায়, কখনও কার্জন হলের লনে। একটি সভা লিটন হলেও বসেছিল মনে পড়ছে। এরকম একটি সভা থেকেই বাংলার সপক্ষে আবেদনপত্র স্বাক্ষরের প্রস্তাব হয় এবং আবুল হাসনাত সাহেব নিজে

www.pathagar.com

বিভিন্ন লোকের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে থাকেন। স্বাক্ষর সংগ্রহে তিনি অত্যন্ত সফলকাম হয়েছিলেন। এমনকি তৎকালীন উর্দুপ্রেমিক পুলিশ প্রধান জাকির হোসেনেরও স্বাক্ষর নিতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হিসেবে আবুল হাসনাত সাহেব যে ঝুঁকি নিয়েছিলেন তাতে তাঁর প্রচণ্ড সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে পরিণত করবার পিছনে অধ্যাপক আবুল কাসেম এবং আবুল হাসনাতের দান অপরিসীম। কিন্তু বায়ান্ন সালে আন্দোলনটি যখন প্রচণ্ড বিস্ফোরণে রূপ পরিগ্রহ করল তখন তাৎক্ষণিকভাবে অনেকেই সামনে চলে এলেন এবং আবুল কাসেম ও আবুল হাসনাত নেপথ্যে পড়ে রইলেন। পৃথিবীতে এ রকমই হয়ে থাকে। আমরা প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারী উদযাপন করি এবং বায়ান্নর আন্দোলনের সময় তাৎক্ষণিকভাবে যাঁরা সামনে এসেছিলেন তাদের কথাই বলি। আবুল হাসনাত এবং আবুল কাসেমের নাম সাধারণতঃ উচ্চারিতই হয় না। ইতিহাসের তথ্যকে যথাযথ সাজাবার জন্য এবং সত্যকে সুস্পষ্ট করবার জন্য আমি এখানে এদের কথা লিখলাম।

আকস্মিকভাবে বায়ান্ন'র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আরম্ভ হয়, নাজিমুদ্দিন সাহেবের একটি অন্যায় উক্তিকে উপলক্ষ করে। লিয়াকত আলী হত্যার পর নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন। প্রধানমন্ত্রী হয়ে ঢাকায় এসে একটি জনসভায় ভাষণ দেন। সেখানে তাৎপর্যহীনভাবে অহেতুক উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করবার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন। তাঁর এই বক্তৃতার ফলে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষুব্ধতা জাগল। এই বিক্ষুব্ধতার ফলশ্রুতিতে একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা রূপ লাভ করে। নাজিমউদ্দিন সাহেবের বক্তৃতা সরকারীভাবে লিখে দেয়া হয়েছিল। চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদের তত্ত্বাবধানে এই বক্তৃতা প্রস্তুত করা হয়। মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার আগ্ পর্যন্ত নাজিমুদ্দিন সাহেব তাঁর ভাষণ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের বাংলা অনুবাদ তদারক করবার জন্য আমাকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তৎকালীন গভর্নর হাউস অর্থাৎ বর্তমান বঙ্গভবনে আমি গিয়েছিলাম বেলা ১১টায়। তখন আজিজ আহমদের কাছ থেকে একেক পাতা করে ইংরেজী ভাষণ আসছিল এবং তথ্য অধিদপ্তরের কর্মচারীরা তা তাৎক্ষণিকভাবে অনুবাদ করছিলেন। আমি এ অব্যবস্থা দেখে আমার অপারগতা জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসি। বক্তৃতার পরদিনই ঢাকায় হরতাল হয় এবং একটি প্রকাশ্য আন্দোলন বিস্ফোরণের দিকে যেতে থাকে।

www.pathagar.com

একুশে ফেব্রুয়ারী আমি সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে গ্রন্থাগারের ভিতরে যাই। সেখানে কিছুক্ষণ কাজ করার পর আমি নিমতলীর যাদুঘরে যাব বলে বেরিয়ে পড়ি। যাদুঘর ভবনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পীদের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। আয়োজনটা হয়েছিল ঢাকা আর্ট গ্রুপের পক্ষে। আর্ট গ্রুপের সভাপতি ছিলেন জয়নুল আবেদীন। তিনি তখন লণ্ডনের স্লেইড স্কুলে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি হিসেবে আমি আর্ট গ্রুপের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছিলাম। আমার সঙ্গে সহ-সভাপতি ছিলেন আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দিন আহমদ, কামরুল হাসান এবং অজিত গুহ। এক্সজিবিশন হবার কথা ছিল ২৮ ফেব্রুয়ারী। গভর্নর ফিরোজ খান নুন উদ্বোধন করবেন—এ কথা ছিল। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে প্রতিদিন বিকেলে আমরা যাদুঘরের সামনের চত্বরে সমবেত হতাম। কখনও কখনও সকাল বেলাও আমরা এসে বসেছি। ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখেও এভাবেই আমরা সকাল ১০ টায় যাদুঘরের ওখানে মিলিত হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। লাইব্রেরী থেকে বেরোবার পর বটগাছের নীচে ছাত্রদের জটলা দেখলাম। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নয়, ঢাকার বিভিন্ন কলেজ এবং স্কুল থেকেও দলে দলে ছাত্ররা এসে সেখানে জড়ো হচ্ছিল। উপাচার্য মোয়াজ্জেম হোসাইন সাহেব ছাত্রদের শান্ত থাকবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন, প্রক্টর মোজাফফর আহমদ চৌধুরীও তাঁর পাশে ছিলেন। আমি সভার কর্মসূচনা দেখে এসেছিলাম। ছাত্রনেতা গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভার কাজ আরম্ভ হয়েছিল এবং ইসতিয়াক আহমদ বক্তৃতা আরম্ভ করেছিল। আমি এ টুকু দেখে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে পড়ি। তখন বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের বাইরে পুলিশ পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি যাদুঘরের চত্বরে এসে কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন, আনোয়ারুল হক, অজিত গুহ এবং আর্ট স্কুলের ছাত্র আমিনুল ইসলামকে সেখানে উপস্থিত দেখলাম। সকলকেই চিন্তিত দেখলাম। আমরা ওখানে বসে থাকতে থাকতে সাইকেল নিয়ে মুনীর চৌধুরী এল এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গুলী চলছে এ খবর আমাদেরকে দিল। আমরা তখন তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, শিল্পকর্ম প্রদর্শনী আপাততঃ স্থগিত থাকবে। ভবিষ্যতে একটি তারিখ নির্ধারণ করা যাবে। আমি অজিত গুহ এবং কামরুল হাসানকে নিয়ে গভর্নর হাউজের বাইরে অবস্থিত পুলিশের ঘর থেকে গভর্নরের মিলিটারী সেক্রেটারীকে টেলিফোন করে জানালাম যে, ২৮ তারিখে প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে না পরবর্তী তারিখ আমরা পরে জানাব।

সেদিনই বিকেলে ফজলুল হক হল মিলনায়তনে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মোজাফফর

www.pathagar.com

আহমদ চৌধুরীর বক্তব্য এখনও আমার কানে বাজছে। তিনি যেন তার সকল অস্তিত্ব দিয়ে একটি চরম যন্ত্রণায় নিপীড়িত হয়ে একটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আর্তরোল নয়, বরঞ্চ অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে সুস্পষ্ট বাক্য রেখেছিলেন। জীবনে দেখি যে, মানুষ সমস্যা এড়াতে চায়, শব্দ ব্যবহারের কৌশলে মুহূর্তের উৎক্ষেপকে সংযত করে এবং অবশেষে ঘটনার প্রবাহ থেকে নিজেকে সম্মানের সঙ্গে সরিয়ে নেয়। এ স্বভাব চিরাচরিত এবং প্রাত্যহিক। কিন্তু মোজাফফর আহমদ চৌধুরী সাহেব এর বিপরীত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষাকর্মের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল সর্বক্ষণের। কোনও আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না কিন্তু একটি মমতার দাবীতে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি নিষ্ঠুরতার প্রতিকার চেয়েছিলেন। সরকারী শাসনের নির্বুদ্ধিতা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখার কথা বলেছিলেন। সমাধান চেয়েছিলেন সকল সমস্যার। আমি এতদিন পর তাঁর বক্তব্যকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতে পারছি না, কিন্তু সুনিশ্চয়তার সাথে একটি কথা বলতে পারি যে, তাঁর বলার ভঙ্গীর মধ্যে আমি তার মর্মযাতনাকে চাক্ষুষ করেছিলাম। এ ঘটনার ফলে তিনি কারারুদ্ধ হন।

একুশে ফেব্রুয়ারী সংক্রান্ত যে সত্য আমার স্মৃতিতে ধরা ছিল এবং বিভিন্ন সময়ে আমি যা নিয়ে লিখেছি তারই একটি চিত্রলিপি এখানে উদ্‌ঘাটন করলাম। আমি কিভাবে এ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তার তাৎক্ষণিক ইতিহাস এবং পূর্বের ইতিহাসও এখানে বর্ণনা করলাম। যারা অনেক দিন ধরে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন ইতিহাস থেকে তারা যেন হারিয়ে না যান তা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। কারও বিরুদ্ধে অপপ্রচার নয়, কিন্তু সকলকেই যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করা ইতিহাসের কর্তব্য। সেই কর্তব্য পালনে আমরা যেন এগিয়ে আসি।

www.pathagar.com

আমার বিত্ত

পৃথিবীতে যে সমস্ত বস্তু একজন শিল্পীর চোখে পড়ে অথবা উপলব্ধিতে জাগে, যা তাকে বেদনা দেয় এবং যা তার সামনে সমস্যার মত, শিল্পী তার সম্মুখীন হবেন এবং এভাবেই জীবনের সঙ্গে তিনি সংগ্রামে রত হবেন। কোনও কিছুকে না হারিয়ে, কোনও কিছুকে অস্বীকার না করে, নির্যাতন সহ্য করে, কিন্তু তাকে অতিক্রম করবার কুশলতাকে নির্মাণ করে একজন শিল্পী মহৎ হবেন। যারা শিল্পকে শুধু গুরুতর মূল্য দিয়েছে, কিন্তু জীবনকে দেয়নি, তাদের পক্ষে মহৎ কিছু সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় না। মহৎ শিল্পী তারাই হতে পারেন যারা জীবনের প্রতিটি বিরাট সমস্যার সাক্ষী হিসেবে থাকেন, তারা সকলের সঙ্গে এক হয়ে তাদের দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাদের সময় এবং কালের সকল সংঘর্ষকে লক্ষ্য করেন এবং সর্বত্র নিজেদের স্বাক্ষর রাখেন। তাই তারা সকল কালের, মানুষের অনেক নিকটে। এভাবে শেক্সপীয়র, প্রুস্ত, বোদলেয়ার, ডস্টয়ভস্কী চিরদিনই মানুষের সমসাময়িক। আমি বড় হয়ে মা'র মুখে শুনেছি যে, আমার খুব শৈশবে অর্থাৎ যখন আমার বয়স দু'বৎসরের মত, তখন মা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বাঁচবার সম্ভাবনা প্রায় ছিল না। তিনি সে সময় শুধু আমার ভবিষ্যতের কথা ভাবছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানের কি গতি হবে। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি একটি বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে আমার হাত ধরে হেঁটে চলেছেন। সেই বিস্তৃত প্রান্তরের এক প্রান্তে একটি বিরাট গাছ, অনেক শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে সে গাছটি একটি ছায়াচ্ছন্ন শান্তি ও নীরবতা সৃষ্টি করেছে। আমার মা'র লক্ষ্য, সে গাছতলায় যাওয়া। সেখানে অপূর্বকান্তি, দীর্ঘদেহী, শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত এক মহাপুরুষ অপেক্ষা করছিলেন। তিনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে সবুজ ঘাস ছিল এবং মাঝে মাঝে প্রদীপের মত এক একটি লাল ফুল। দূর থেকে আমার মা'র চোখে মনে হচ্ছিল যে, সবুজের চিহ্নগুলো কখনও নীল, কখনও ধূসর, কখনও শ্বেত কপোতের মত। মা চলছিলেন স্বপ্নের মধ্যে। তার মনে হচ্ছিল, তিনি চিরদিন যেন আমার জন্মের পূর্ব থেকেই হেঁটে চলছিলেন। কারও একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে ভেবেছিলেন, অত্যন্ত মহান কেউ—যাকে তার একান্ত প্রয়োজন। অগ্রসর হতে হতে তিনি যখন ছায়াচ্ছন্ন সেই বিরাট গাছের

www.pathagar.com

তলদেশে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর মনে হল, তিনি হযরত ইব্রাহীমের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তাঁর হাতে আমাকে সমর্পণ করে বললেন, 'আমি যদি বেঁচে না থাকি তাহলে আমার সন্তানকে আপনি রক্ষা করবেন।' মা বলেছিলেন, এর পরই তার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং তিনি ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করেন। বড় হয়ে বহুদিন মা'কে বলতে শুনেছি, 'তোমার কর্তব্য হচ্ছে ধর্মের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং সাধক হওয়া। আমাদের পূর্বপুরুষ সকলেই সূফী তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তোমারও সেই পথ অবলম্বন করা উচিৎ।'

আমি কোনও এক জায়গায় লিখেছি যে, আমি আমার মা'র ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে পারিনি। আমি রক্ত গোলাপের উপর একটি প্রজাপতিকে দেখে, মুগ্ধ হয়ে, তার পিছনে ধাবমান হয়েছি। কিন্তু মহাপুরুষ হতে ভয় পেয়েছি। আমি সাধারণ মানুষের একজন হয়ে, তাদের সৌভাগ্য এবং বিনয়ে, তাদের অসহায়তা এবং শ্রমে তাদেরই একজন হতে চেয়েছি। তবে হতে চাওয়া এক কথা আর যথার্থ হওয়া অন্য কথা। কবীর বলেছেন, রুখাসুখা গমের রুটি, তার স্বাদই বা কি। সুতরাং তাতে লবণ আছে কি নেই, সেটা ভেবে কি কোন লাভ আছে। শিরোদেশ যখন দান করেছি তখন রোদন করে তো লাভ নেই। কথাটির অর্থ হচ্ছে—মানুষের প্রীতির মধ্যে, মানুষের আকাংক্ষার মধ্যে, মানুষের বেদনার মধ্যে, মানুষের অসহায়তার মধ্যে, মানুষের চিত্তের শুভবুদ্ধির মধ্যে জাগ্রত হতে পারাই সবচেয়ে বড় কথা। যিনি কবি, তিনি মানুষের বিভিন্ন অভিনিবেশের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেন। পৃথিবীতে জীবন ক্ষণকালীন এবং মৃত্যু অবধারিত। অকস্মাৎ একটি বজ্রপাতে একটি বৃক্ষ যেমন নিঃশেষ হয়ে যায়, মৃত্যুও তেমনি মানুষের অপ্রস্তুতির মধ্যে তাকে নিঃশেষ করে। সুতরাং যতদিন আমরা জীবিত থাকি, ততদিন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, কর্তব্যবোধে মানুষে মানুষে সম্পর্কের একটি সর্বস্ব নির্মাণ করা। আমাদের মৃত্যু যদি কখনও না হত, আমরা তাহলে কি অনন্তকাল প্রেম ও মমতার মধ্যে বাস করতাম? ঘৃণা ভুলে যেতাম ও ঈর্ষার চিহ্ন থাকতো না? ব্যর্থতায় ভীত না হয়ে অনবরত নতুন করে জীবন আরম্ভ করবার চিন্তা করতাম? এসব প্রশ্নের উত্তর কি জানি না। শুধু জানি, এ পৃথিবীতে সময় নেই বলেই আমাদের এত ভয়, বিদ্বেষ ও ঘৃণা। জীবনে এবং মৃত্যুতে পরিত্যক্ত হবো বলেই আমরা সর্বসময় ঈর্ষার মধ্যে বাস করি। জীবনের যাত্রা সুষম ও সুস্থ করতে হলে, সম্পূর্ণ করতে হলে আমাদের সকলকে প্রেমে ও বৈরাগ্যে একত্রিত হয়ে পথ চলতে হবে। আমাদের মমতার প্রয়োজন। মানুষের চরম অসহায়তা তখনই হয় যখন সে অনুভব করে, কেউ তাকে ভালবাসছে না। যে নিঃশ্বাসে আমাদের জীবন সচেতন, তা প্রেমের নিঃশ্বাস, যে অন্ন গ্রহণ করছি তা-ও প্রেমে অভিসিক্ত।

www.pathagar.com

সব মুহূর্তের জন্য এ প্রেমকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তখন শূন্যতায় ভীত না হয়ে, মমতাবোধে অবসরকে সম্পূর্ণ করতে হবে। সমৃদ্ধির পৃথিবীতে, সমাজে নিয়মিত পথযাত্রায়, পরিমাপসহ বাক্যালাপের বন্ধ্যাত্বে এবং সহনশীলতার অভাবের নিঃসঙ্গতায় আমরা হৃদয়কে হারিয়ে ফেলেছি। অভিমানের মূল্য নেই, শোকের তাৎপর্য নেই। শুধু প্রতিদিন অপরিসীম শূন্যতায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। এভাবে সময় হারিয়ে কোন কিছুই দেখতে পাই না, কখন যে চড়ুইগুলো এসে কলরব করে চলে যায় জানি না, আমগাছের নতুন পাতাগুলো দেখতে চেয়েও দেখা হয় না। শুধু যখন শুকনো পাতায় শব্দ করে কাঠবিড়ালী গাছ বেয়ে ওঠে এবং একটি কাক হঠাৎ আর্তনাদ করে তখন মনে হয়, আনন্দের সঞ্চয়গুলো বুঝি হারিয়ে গেল। তখন ভাবি, দুপুরের রোদে চাঁপা ফুল হয়তো মমতা ছড়িয়েছে, বটগাছ ছায়া বিছিয়েছে, কিন্তু আমি সে মমতা এবং ছায়ার কোনটাতেই নেই। আমি এ মুহূর্তে একটি বিরাট কর্মব্যস্ততার উচ্চকণ্ঠ মাত্র।

আমার মা জন্মসূত্রে বিপুল বিত্তের অধিকারিণী ছিলেন। মা'র বড় এক ভাই এবং এক বোন ছিলেন। শৈশবে ভাইয়ের মৃত্যু ঘটে একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় এবং বড় বোন দু'টি সন্তান রেখে অল্প বয়সে প্রাণ ত্যাগ করেন। আমার নানী তখন জীবিত। তিনিই সম্পত্তির অধিকারিণী। তখনকার নিয়ম অনুসারে আমার নানীর মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ সম্পত্তি আমার মা'রই পাবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি তার প্রাপ্য অংশের অর্ধেক স্বেচ্ছায় তাঁর বোনের নাবালক ছেলে এবং মেয়েকে দান করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষার কথা চিন্তা করে এবং ভগ্নিপতির সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত ঘটায় তিনি সর্বস্ব পরিত্যাগ করে আমাদের চার ভাইবোনকে সঙ্গে নিয়ে, বাবার হাত ধরে বাবার কর্মস্থলে চলে যান। বাবা দরিদ্রের সন্তান ছিলেন এবং আমার মা'র তুলনায় তার কোন ঐশ্বর্য ছিল না বললেই হয়। মা আমার বাবার শূন্য সংসারে এসে সে সংসারকেই জীবনের অনুকূল করে তোলেন।

আমি আমার জীবনে ঐশ্বর্যের প্রতাপ কখনও অনুভব করিনি। নিঃস্ব ছিলাম না, সংসারের প্রয়োজনের জন্য যতটুকু অর্থের প্রয়োজন তা ছিল। কিন্তু উদ্বৃত্ত অর্থ আমার ছিল না। তবে আমার স্বস্তি ছিল এবং আনন্দ ছিল। প্রয়োজনের সীমার বাইরে আমি কখনও যাইনি, অন্যায়ভাবে কখনও অর্থোপার্জন করিনি। কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব কখনও হয়নি। স্বাচ্ছন্দ্যটা মনের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। মানুষের যদি ক্ষোভ না থাকে, অর্থের অতিরিক্ত আকাঙ্খা যদি না থাকে এবং নিশ্চিন্ততা থাকে, তাহলে সে কোন প্রকার অভাববোধ করে না। অভাববোধের কারণে মানুষের চিত্তে গ্লানি আসে। এবং নিজেকে ক্ষুদ্র ভাববার দুর্বলতা আসে। আমি জীবনে কখনও

www.pathagar.com

অনুভব করিনি যে, বিপুল ঐশ্বর্যের আমার প্রয়োজন আছে। এম. এ. পাশ করার পর কলকাতায় কর্মজীবন আরম্ভ করি প্রাইভেট টিউশনি দিয়ে। এম. এ. পরীক্ষার্থীনী বেনারসের একটি হিন্দু মেয়েকে সপ্তাহে তিনদিন পড়াতাম, মাসে একশ' টাকা করে পেতাম। তখন আমি কলকাতায় একটি মেসে থাকতাম। এই একশ' টাকাই আমার জন্য যথেষ্ট ছিল। পরে হুগলীতে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে লেকচারার হিসেবে যোগ দেই। সেখানে মাসিক বেতন ছিল ১২৫ টাকা। এ টাকা থেকে যা বাঁচত, তা ঢাকায় বাবার সংসারে পাঠাতাম। এরপর আমি অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে যোগ দেই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস আগে ঢাকা রেডিওতে বদলী হই। ১৯৫০-৫৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সিনিয়র লেকচারার হিসেবে কর্মরত ছিলাম। সেখান থেকেই আমি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেই। ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমীর পরিচালক পদে যোগ দেই। এ ইতিহাসটা বলছি এ কারণে যে, অনবরত ক্ষেত্র পরিবর্তনের কারণে আমার প্রফিডেন্ট ফাণ্ড গড়ে ওঠেনি, আমি কোন প্রকার সঞ্চয় করতে পারিনি। সঞ্চয়হীন সাধারণ সহজ জীবন সর্বসময়ই আমার ছিল এবং এখনও আছে। মাঝে মাঝে অবাক লাগে, যখন আমার বিত্ত সম্পর্কে নানাবিধ কাল্পনিক মন্তব্য শুনি। আমার সমসাময়িক যাঁরা তাঁদের প্রত্যেকেরই কারও ধানমণ্ডিতে, কারও গুলশানে, কারও বনানীতে বাড়ি আছে। এসব জায়গায় বাড়ি ভাড়াও অনেক। স্বদেশী-বিদেশীদের ভাড়া দিয়ে এসব বাড়ির মালিকদের প্রচুর অর্থাগম হয়। তাদের এই অর্থকরী সৌভাগ্যে আমি আনন্দিত।

কেউ বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমার কিন্তু একটিও বাড়ি নেই কিংবা এক কণা জমিও নেই। যে বাড়িতে আমি থাকি সে আমার স্ত্রীর বাড়ি ছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর বাড়িটি দলিল করে আমার চার ছেলেমেয়ের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। দলিলে আমার পক্ষে শুধু এ কথাটুকু আছে যে, এই বাড়িতে মৃত্যু পর্যন্ত আমার বসবাসের অধিকার থাকবে। আমি একটি শোবার ঘর পাব এবং পড়ার ঘর পাব। এ অবস্থাতেই আমি আছি। যে ডইংরুমে বসি এবং যেখানে আমার বইপত্র রয়েছে, সে ঘরটিও জীর্ণ দশায় এবং সে ঘরের আসবাবপত্র চোখ ধাঁধানো নয়। আমার অবস্থা এত বেশি সুস্পষ্ট যে, যে কেউ একবার চোখ মেলে তাকালে বুঝতে পারবে যে, আমি আমার নিজস্ব বেতন-ভাতার উপর নির্ভর করে বেঁচে আছি। এ অবস্থায় বাস করতে আমার কোন প্রকার মানসিক বৈকল্য নেই। আমার শুধু জিজ্ঞাসা ঃ যারা আমাকে কুচক্রী এবং অর্থলোভী বলে করেন, তারা কি নিজেদের চারিত্রিক গুণাবলী আমার উপর আরোপ করে এসব কথা বলেন? ছলনা এবং মিথ্যাচার যাদের

www.pathagar.com

স্বভাব, অপরাধ প্রবণতায় যারা ভয়ংকর, কল্যাণকে অবদমিত করার প্রয়াস যাদের নিরন্তর, তাদের কাছ থেকে ঘৃণায় আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। আমি আমার তুচ্ছ সম্পদ নিয়ে নিশ্চিন্তে জীবনের শেষ সময়গুলো কাটিয়ে যেতে চাই।

করাচীতে যখন ছিলাম তখন উত্তর নাজিমাবাদে পাঁচ হাজার টাকায় একটি জমি পেয়েছিলাম। মনে করেছিলাম—অবসর গ্রহণের পর সেখানে বাড়ি বানিয়ে থাকব। কিন্তু তা আর হয়নি। আমি ঢাকায় চলে আসি এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান ভেঙ্গে যায় এবং আমি আমার করাচীর জমিটুকু হারাই। আমি জমিটি বিক্রি করতে পারিনি। পরবর্তীতে বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন উচ্চপদ অধিকার করেছিলাম বটে এবং সেই কারণে দেশের সকল প্রশাসন-প্রধানদের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আমি ইচ্ছে করলে তাদের কারও না কারও কাছ থেকে জমি অথবা পরিত্যক্ত বাড়ি পেতে পারতাম। কিন্তু আমি কারও কাছ থেকে কোনও সুযোগ নেইনি। আমার স্ত্রীও এ ব্যাপারে কোনদিন আমার উপর চাপ সৃষ্টি করেনি। আমার মনে হয়, আমার বাবার চরিত্র আমাকে প্রভাবিত করেছিল। বাবা কোনদিন বাড়ি করে যাননি, তিনি আজীবন ভাড়াটে বাসায় থেকেছেন। তার একটি উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। তিনি বলতেন, 'যেহেতু পৃথিবীতে আমি চিরকাল বসবাস করতে পারব না, সুতরাং জীবনের স্বল্পকালীন সময়ের জন্য একটি বাড়ি বানিয়ে কি লাভ?' মা'কেও দেখেছি—তিনি বাবার এ মনোভাবকে সমর্থন করতেন। মা আরও বলতেন, 'পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষ আপন ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কেউ কারও জন্য ভাগ্য নির্ধারণ করে দিতে পারে না। আমার ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। তাদের ভাগ্যে থাকলে তারা নিজেরাই বাড়ি করতে পারবে, আমার দেয়া বাড়ি তাদের প্রয়োজন হবে না।' সন্তানদের জন্য বিত্ত রেখে যাওয়া সম্পর্কে আমার মাতাপিতার এই উদাসীনতা নিয়ে কখনও প্রশ্ন করিনি, এখনও করি না। স্কুল জীবনে টলস্টয়ের একটি গল্প পড়েছিলাম। গল্পটির নাম 'কতটুকু জমি মানুষের প্রয়োজন!' গল্পটি আমাকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। এখনও এই গল্পটির কথা মনে আছে। সত্যিই তো, বিরাট অট্টালিকা এবং ঐশ্বর্যসম্ভার মানুষকে কখনও শান্তি ও স্বস্তি দেয় না। মানুষ স্বস্তি পায় আত্মতৃপ্তিতে। দারিদ্র্যে দুঃখের কিছু নেই, বরঞ্চ দারিদ্র্য মানুষকে এক প্রকার নিশ্চিন্ততা দেয় যে, কোন ব্যাপারেই তার দায়ভাগ নেই। আমি অবশ্য দরিদ্র নই, তবে বিত্তবানও নই। আমার সীমিত প্রয়োজন পূর্ণ করে আমি শান্তিতেই আছি। অবশ্য এটাই যে আদর্শ জীবনযাপন—তা আমি বলি না। মানুষ সুযোগ পেলে বাড়িঘর করবে—এটাই তো স্বাভাবিক। আমি করিনি; সে আমার মানসিকতা।

www.pathagar.com

আমি একজন শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষাবিদ হিসেবেই বিভিন্ন সরকার কর্তৃক শিক্ষাগত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত হয়েছি। সেই অর্থে আমি একজন টেকনোক্র্যাট বা প্রযুক্তিবিদ। যে সমস্ত কর্মে আমি নিযুক্ত ছিলাম, সে সমস্ত কর্মে আমি কোন রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান দ্বারা পরিচালিত হইনি। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আইন বা অর্ডিন্যান্স ছিল—সেসব আইন দ্বারাই আমি পরিচালিত হয়েছি। বাংলা একাডেমীর নিজস্ব আইন ছিল, যে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলাম সেখানকারও আইন ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনেও আইন ছিল। এ সমস্ত আইনের আওতায় আমাকে কাজ করতে হয়েছে। সুতরাং আমি কখনও কোন সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে কাজ করেছি—এ কথা কেউ কখনও প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। অর্থাৎ এক কথায়, আমি কারও 'দালাল' ছিলাম না। যদি আমাকে দালাল বলতে হয় তাহলে বলতে হবে আমি স্বাধীন বাংলাদেশের দালাল। সততা, নিষ্ঠা, ন্যায় বিচার এবং অকুতোভয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমি আমার কর্ম সম্পাদন করেছি এবং তার বিনিময়ে আমি আনন্দ ও সত্যকে পেয়েছি। পার্থিব কোন উপকার কারও কাছ থেকে পাইনি। আমার সমস্ত কাগজপত্র এবং কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। আমি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ছিলাম, সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে আমার সময়কালীন কর্মকাণ্ডের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। কৌতূহলী ব্যক্তিমাত্র এগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পারেন এবং আমার যথার্থ পরিচয়লিপি উদ্‌ঘাটন করতে পারেন।

বাংলা একাডেমীতে থাকাকালীন সময়ে আমার সততার জন্য আমি শাস্তি পেয়েছিলাম। তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্নর মোনেম খাঁ তাঁর নির্দেশমত আমাকে কাজ করতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি তা করিনি। আমি বলেছিলাম, 'সরকার আমাকে একটি আইন দিয়েছেন, সে আইন অনুসারে আমি কাজ করে থাকি। মাঝে মাঝে সরকারী নির্দেশনামা আসে, সেই নির্দেশনামাগুলো যদি একাডেমীর আইনের পরিপন্থী না হয়, তবে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করি। এর বাইরে কিছু করার অধিকার আমার নেই।' মোনেম খাঁ আমার কথায় রুষ্ট হয়েছিলেন এবং একমাত্র তাঁর রোষের কারণেই আমাকে একাডেমী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। একই রকম ঘটনা ঘটে আমি যখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য—তখন। একটি ছাত্র সংগঠনের দাবী ছিল, তাদের দলের কয়েকটি ছাত্রকে ভর্তি করতে হবে। আমি কোনক্রমেই তাদের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করিনি। এই নিয়ে ছাত্ররা আন্দোলন করে। কিন্তু তাতেও যখন আমি নমনীয় হলাম না, তখন আমাকে সেখান থেকে সরানো হল। এ ক্ষেত্রেও আমার বিবেকের কাছে পরিচ্ছন্ন ছিলাম এবং আমি আমার আচরণের জন্য দুঃখিত নই। এরপর আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

উপাচার্য হই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আমার জন্য কোন অসুবিধে করেনি, সেখানে আমি শান্তিতে ও মর্যাদায় ছিলাম। সেখান থেকে আমি সরে আসি অন্য কারণে। শহীদ জিয়ার বিশেষ অনুরোধে আমি তাঁর মন্ত্রীসভায় যোগ দেই। বলামাত্রই আমি যোগ দেইনি, আমন্ত্রণের প্রায় ছ' মাস পর আমি যোগ দেই। আমার বন্ধুদের কেউ কেউ আমার মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়াটা পছন্দ করেননি। শান্তিনিকেতনের আচার্য ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেন এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু শহীদ জিয়াকে ভালবাসতাম এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শ্রদ্ধা করতাম। তাই তার অনুরোধ আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। মন্ত্রী হিসেবে আমার কার্যকালে শিক্ষাঙ্গনে কোন নৈরাজ্য ঘটেনি। প্রকৌশল এবং পলিটেকনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথার্থ দিক নির্দেশনা এসেছে। কিন্তু সেখান থেকে আমাকে সরে আসতে হল রাজনৈতিক কারণে। আমার আসার সময়ে ক্যাবিনেট বা উপদেষ্টা পরিষদ ছিল প্রধানতঃ ট্যাকনোক্রাট্সদের নিয়ে গঠিত। কিন্তু জিয়াউর রহমান যখন সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি রাজনীতিকদের নিয়ে ক্যাবিনেট গঠন করবেন তখন আমাদের কয়েকজনকে সরে আসতে হল। ডঃ রশীদ, ডঃ মোজাফফর আহমেদ, ডঃ এম. আর খান, আশফাকুর রহমান এবং আমি মন্ত্রীসভা থেকে সরে গেলাম। শুধু ডঃ হুদা রাজনীতিবিদদের নিয়ে গড়া ক্যাবিনেটে রয়ে গেলেন। আমি শিক্ষাক্ষেত্রে ফিরে গেলাম।

এরপর কিছুকাল আমি সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত থাকি এবং ১৯৮৩ সালে অবসর গ্রহণ করি। পরবর্তীতে ডঃ আবদুল বারীর কার্যকাল শেষ হওয়ার পর আমি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হই। আমার আজীবন শিক্ষাক্ষেত্রের কর্মসাধনার অধিকার হিসেবেই মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান হওয়ার অধিকার আমি অর্জন করেছিলাম। একজন না একজনকে মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতেই হত, সেখানে আমার নিযুক্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং যে সরকার আমাকে নিযুক্তি দিলেন সেই সরকারও আমার প্রতি বিশেষ কোন কৃপা করেননি। একটি দেশে বিভিন্ন কর্ম পরিচালনার জন্য দক্ষ ব্যক্তিদের প্রয়োজন। এরা কোন বিশেষ সরকারের রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে যুক্ত নয়, এরা শুধু বিশিষ্ট কর্মধারার গতিপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত। কর্মসাধন ক্ষেত্রে এরা হবেন কর্তব্যনিষ্ঠ, দক্ষ এবং আদর্শবান। তাছাড়া কোন কোন কর্মক্ষেত্র এমন, যেখানে কোনো বিশেষ সরকারকে তোষণ করার কোন সুযোগই নেই। যেমন মঞ্জুরী কমিশন এবং কর্ম কমিশন। নিজস্ব আইনের আওতায় এরা কাজ করেন। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারী নির্দেশের কোন প্রয়োজনই পড়ে না। মঞ্জুরী কমিশনে আমার

www.pathagar.com

করণীয় ছিল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুদানের ব্যবস্থা করা, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা এবং তা দূর করার ব্যবস্থা করা, নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার ব্যবস্থা করা এবং এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত আরও যে সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে—সেগুলো পালন করা। দেখা যাচ্ছে, এ সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের কোন সুযোগই নেই এবং কোন সরকারকে সন্তুষ্ট করার বিধি-বিধানও নেই। যিনি কর্মদক্ষ, তিনি তার কর্মদক্ষতার গুণে সন্তুষ্টি অর্জন করবেন, অন্য কোন উপায়ে নয়। সুতরাং মঞ্জুরী কমিশনের কর্মপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত থেকে আমি দেশ ও জাতির পক্ষে কাজ করেছি, কোন বিশেষ দল বা গোত্রকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি কিছু করিনি। মানুষ তার কর্মধারায় কোনও বিশেষ সময়ের প্রেক্ষিতে আবদ্ধ নয়, কোন্ সরকার প্রধানের সময় আমি কাজ করেছি তার দ্বারা আমার পরিচয় নয়। বরং কোন্ কাজ কিভাবে করেছি, তার দ্বারাই আমার পরিচয়। আমরা যদি দেশের হিতার্থে এ পরিচয়কে মূল্য না দেই, তাহলে দেশের সর্বনাশ হবে।

নাইজেরিয়ায় একবার একটি বিদ্রোহ হয়েছিল, বায়াফ্রা প্রদেশ মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিল। উজুকু বায়াফ্রাকে স্বাধীন করবার জন্য এক বছর পর্যন্ত প্রাণপণ সংগ্রাম করেছিল। কিন্তু ে পরাজয় ঘটল। বায়াফ্রার পরাজয়ের পর নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়াকুবু গাওয়ান বায়াফ্রাবাসীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'আমরা এতদিন যুদ্ধ করেছি একে অন্যের সঙ্গে, এখন আমরা একত্রিত হয়ে কাজ করব। আমাদের মধ্যে এখন আর কেউ জয়ী বা বিজিত নই, আমরা এখন সম্মিলিতভাবে দেশের কর্মপ্রবাহে মিশে যাব এবং দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাব।' এই অসাধারণ মনোভাব প্রকাশ করে গাওয়ান বিশ্ববাসীর কাছে সম্মান অর্জন করেছিলেন। জয়লাভের পর তিনি দেশের আনাচে-কানাচে শত্রু সন্ধান করে বেড়াননি, দেশ গড়ার কাজে সকলকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা সতত শত্রু সন্ধান করি এবং দেশ ও জাতিকে সুস্থির হতে দেই না। একটি সরকারের যখন পতন ঘটে তখন পরবর্তী সরকার পূর্ববর্তী সরকারে কর্মরত সকল মানুষকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে, আবার যখন নতুন একটি সরকার আসে তখন সন্দেহের পালা বদলায়। এভাবে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের দক্ষ মানুষগুলো অসহায়বোধ করতে থাকে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের কর্ম ব্যবস্থাপনায় অবিরাম বিচ্যুতি দেখা দিতে থাকে।

www.pathagar.com

আমরা গণতন্ত্র চাই, গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ঃ ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা এবং ইচ্ছার স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। স্বৈরশাসনের নিয়ম হচ্ছে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা এবং বাক স্বাধীনতা বিবর্জিত একটি নিষ্ঠুর ব্যবস্থাপনার জন্ম দেয়া। আমরা আশা করেছিলাম, আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মৌলিক অধিকার ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বাকরুদ্ধ জাতি সকল কুণ্ঠাকে অতিক্রম করে আপন বক্তব্য প্রকাশ সক্ষম হবে—এটাই তো কাম্য।

www.pathagar.com

আজন্ম মার্কিনী

বিখ্যাত ইংরেজ কবি অডেন জীবনের শেষ পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করেছিলেন। কবি হিসেবে, পণ্ডিত হিসেবে এবং ন্যায়ানুগ বুদ্ধিজীবী হিসেবে বিশ্বব্যাপী তাঁর খ্যাতি ছিল। বিভিন্ন দেশে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন, সে সব দেশে ক্ষণকাল অবস্থান করেছেন, বক্তৃতা করেছেন এবং তার নিজস্ব কাব্য প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসতি স্থাপন করলেন। বিপুল বিত্তের অধিকার, সাহিত্য ও শিল্পকর্মের প্রভূত সুযোগ তাঁকে আমেরিকার দিকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু কোনদিন কেউ তাঁকে 'মার্কিনী' বলেনি। তিনি আজীবন ইংরেজই থেকে গিয়েছিলেন। আর একজন খ্যাতনামা কবি হচ্ছেন স্টীফেন স্পেন্ডর। স্পেন্ডরকে জানবার এবং অত্যন্ত কাছে পাবার সুযোগ আমার হয়েছিল। লণ্ডনে, ফ্রাংকফোর্টে, বার্লিনে, রিও ডি জেনিরোতে এবং টোকিওতে আমরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একত্রিত হয়েছি। স্পেন্ডর ছিলেন ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষের মানুষ। পৃথিবীর যেখানেই যখন ব্যক্তি স্বাধীনতায় আঘাত লেগেছে, তিনি তখনই তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনিও বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে অবস্থান করছেন। এখনও বৃটিশ কাউন্সিলের আবেদনক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিতে যান। কিছু দিন আগে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসতি নিয়েছেন বলে তাকে কেউ মার্কিনী বলে না। তিনি আজন্মই ইংরেজ, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ইংরেজ।

বর্তমানে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্য-সাধক এবং সমাজকর্মীরা আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। আমেরিকায় যে সুযোগ-সুবিধা তারা পান, অন্যত্র তাঁরা তা পান না। জ্ঞানের বিকাশের জন্য যে সুযোগটি অপরিহার্য, তা আমেরিকায় পাওয়া যায়। আমেরিকা গণতন্ত্রের দেশ, সেখানে একজন ব্যক্তির ক্ষমতা বিকাশের সর্বপ্রকার সুযোগ আছে। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত পোলিশ লেখক আইজাক বেসেভিস সিঙ্গার একবার একটি আলোচনা সভায় বলেছিলেন যে, তিনি একটি নির্যাতন থেকে মুক্ত পৃথিবীতে এসেছেন, আমেরিকায় তাঁর স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। এই স্বাধীনতাকে মানুষ কাম্য করে।

www.pathagar.com

বৃটিশ আমলে আমেরিকাকে আমরা চিনতাম না। আমি আমার ছোটবেলায় আমেরিকার মানুষকে কখনও দেখিনি। আমাদের স্কুল ছিল ইংরেজ-শাসিত স্কুল। হেডমাস্টার ছিলেন একজন ইংরেজ। তাঁর নাম ছিল টি. জে. কলিন্স। প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন একজন খ্যাতনামা ইংরেজ—ডঃ মাইকেল ওয়েস্ট। আমি ছোটবেলায় ইংরেজী ভাষা ও উচ্চারণের প্রতাপের মধ্যে মানুষ হয়েছি। ঢাকা শহরে তখন আরও ইংরেজদের সাক্ষাৎ পেয়েছি। এদের মধ্যে একজন ছিলেন সদরঘাটের ব্যাপ্টিস্ট মিশনের। ঢাকার কমিশনার এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট—এঁরাও ছিলেন ইংরেজ। অবশ্য ঢাকা শহরে আমেরিকান মিশনারীরাও ছিল, তারা একটি স্কুলও চালাত। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার পরিচয়ের কোন সুযোগ ঘটেনি। ইংরেজ শাসন আমলে স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজদের অহমিকার পরিবেশে আমরা বড় হয়ে উঠেছিলাম। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ছিল ইংরেজদের নীতি-নির্ধারণের সম্পূর্ণ অধিকার। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার ধারাক্রম ছিল ইংরেজী আদর্শে পরিচালিত এবং পরিশীলিত। ঢাকা কলেজে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগে ইংরেজ অধ্যাপক ছিল। এদেশীয় অধ্যাপক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ইংল্যাণ্ডে। একটি শৃঙ্খলা এবং সম্পন্ন নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে আমরা তখন বাস করতাম। আমি স্কুলে থাকতে ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলো পড়া শেষ করেছিলাম। ডঃ ওয়েস্ট কর্তৃক সংক্ষেপিত অনেকগুলো ইংরেজী ক্লাসিক্স ছিল, সেগুলোর সব কটাই আমি পড়েছিলাম। আমেরিকার লেখকদের মধ্যে ব্রেট্ হার্টির একটি গল্প এবং ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতা পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। সবকিছু মিলে ঢাকা শহরে ইংরেজদের ভাষা ও সংস্কৃতির একটি প্রতাপ অনুভব করা যেত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ঢাকায় ইংরেজ এবং আমেরিকান সৈন্যদের ছাউনি পড়ল। শিক্ষিত কিছু যুবক এ সমস্ত সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল। এরা কখনও কখনও সুযোগ খুঁজত আমাদের দেশের মানুষদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। এভাবে ঢাকায় দু'টি আমেরিকান সৈন্যের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শুনে কয়েকটি আমেরিকান উপন্যাস পড়তে দেয়। খুব নামকরা কোন বই নয়, সময় কাটানোর জন্য স্নায়ু-উত্তেজক কিছু বই। বইগুলোর নাম আমার মনে নেই, মনে থাকার কথাও নয়। আমেরিকার সাহিত্যের সাথে এভাবেই আমার পরিচয় ঘটে। এ পরিচয় এত লঘু যে, তা আমার মনে কোন দাগ কাটতে পারেনি। শুধু একটি কথা মনে আছে যে, মার্কিনী সৈন্য দু'টির ইংরেজী উচ্চারণ আমি সহজে বুঝে উঠতে পারিনি।

www.pathagar.com

কলকাতায় যখন অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওতে চাকরি করি, তখন হাওয়ার্ড ফাস্ট কলকাতায় এসেছিলেন। ফাস্ট আমেরিকান সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে এসেছিলেন। এদেশে অবস্থানকালে তিনি এদেশের সংস্কৃতিকে জানবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার প্রতি তার আগ্রহ ছিল এবং বাংলার লোকগীতির প্রতি তার এক প্রকার মুগ্ধতা ছিল। তিনি কয়েকবার গারস্টিন প্লেইসে অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও অফিসে এসেছিলেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি তখন একজন তরুণ গল্পলেখক। পরবর্তীতে তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক হয়েছিলেন। ১৯৮৩ সালে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা নিউইয়র্কে। অত্যন্ত ধীর, স্থির, বিনয়ী এবং মানবহিতৈষী পুরুষ হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কলকাতায় যখন তাঁকে দেখি, তখন তার কোন লেখা আমি পড়িনি। কলকাতায় তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতি নিয়ে খোঁজ-খবর করেছিলেন। কলকাতায় শীতের সময় ভুটানীরা গড়ের মাঠে তাবু ফেলে উলের সোয়েটার তৈরি করে বিক্রি করত, এখনও করে। এই দৃশ্যটা হাওয়ার্ড ফাস্টকে খুব মুগ্ধ করেছিল। অনেক পরে ১৯৮৩ সালে যখন তাঁর সাথে শেষ সাক্ষাৎ হয়, তখনও তিনি ঐ দৃশ্যটার কথা আমাকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, মানুষকে তার জীবন নির্বাহের কর্মে যতটা সত্যরূপে পাওয়া যায়, অন্য কোন ক্ষেত্রেই সেভাবে পাওয়া যায় না। কথাটা খুবই সত্য।

যে সময়ে হাওয়ার্ড ফাস্টকে কলকাতায় দেখি, সে সময় বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ই. এম. ফরস্টার কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতায় তিনি বিপুল সংবর্ধনা পেয়েছিলেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে কলকাতার বিভিন্ন মহলে তিনি সংবর্ধিত হয়েছিলেন। আমরা অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওতে তার একটি কথিকা প্রচার করেছি। তিনি 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' নামক উপন্যাসের জন্য ইংরেজী সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ফরস্টারকে আমি সর্বশেষ দেখি ক্যাম্ব্রিজে, ১৯৫৬ সালে। তখন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ। তিনি আজন্ম এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীদের প্রতি মমতাপ্রবণ ছিলেন। কেম্ব্রিজে তিনি আমাকে আনন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। হাওয়ার্ড ফাস্টের পরপরই ফরস্টারের কথা বললাম এ কারণে যে, ফরস্টার তার বলিষ্ঠ প্রভাব নিয়ে আমাদেরকে বেশি আকর্ষণ করেছিলেন। আমরা ইংরেজদের দ্বারা তখনও প্রভাবিত। এই প্রভাবটি বহুদিন পর্যন্ত বলিষ্ঠভাবে উচ্চকিত ছিল। ফরস্টারের কলকাতা আগমনের কাছাকাছি সময়ে বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার নোয়েল কাওয়ার্ড কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁকেও আমরা অল্ ইণ্ডিয়া

www.pathagar.com

রেডিওতে নিয়ে এসেছিলাম। আমাদের সাংস্কৃতিক বলয়ে তখনও মার্কিনী চিন্তা প্রবেশ করতে পারেনি।

পাকিস্তান যখন হল তখন আমাদের দেশে মার্কিনীদের আগমন ঘটল এবং আমরা আমেরিকাকে আবিষ্কার করতে শিখলাম। আমার মনে আছে, সম্ভবত ১৯৫০ সালে, আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তখন আন্তর্জাতিক কোন সংস্থার একজন প্রতিনিধি ঢাকা এসেছিলেন। ভদ্রলোক ছিলেন একজন আমেরিকান নিগ্রো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীনের অফিসে তাঁকে একটি সংবর্ধনা দেয়া হয়। ডীন হিসেবে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় অতিথিকে স্বাগত জানান। তিনি বলেছিলেন, 'আজকে আমাদের এই অতিথিকে দিয়ে আমরা আমেরিকাকে আবিষ্কার করেছি। এতদিন আমরা ইংল্যাণ্ডকে চিনতাম, এখন আমেরিকাকে চিনতে চলেছি। তবে আমাদের ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষায় ইংরেজী চিন্তাধারা এতদূর প্রোথিত যে, সহজে আমেরিকাকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। না হলেও আমরা চেষ্টা করে যাব ক্রমশঃ আমেরিকাকে যেন বুঝতে পারি।' আরও কি কি বলেছিলেন, মনে নেই। তবে এ ক'টি কথা সেই সময় এত মূল্যবান ছিল যে, আজও কথাগুলোর রেশ কানে বাজছে।

একটি দেশ ক্রমশঃ পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজস্ব রীতি-প্রকৃতিকে চিহ্নিত করতে শেখে। এই চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে আমেরিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বৃটিশ আমলে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যে, আমেরিকাকে জানার আমাদের প্রয়োজন আছে। তাঁর সময়ে এদেশের লোকেরা যখন উচ্চ শিক্ষার্থে ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছে, তখন তিনি তার একমাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কৃষিবিদ্যা শিখতে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যে, শুধুমাত্র একটি দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে স্পর্শ করে কোন দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই তিনি আমেরিকার শিক্ষা পদ্ধতিকেও জানবার চেষ্টা করেছিলেন। একটি দেশের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে একটি স্বকীয়তা নির্ধারণ করা। এই স্বকীয়তা নির্ধারণ করতে হলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে আমাদের জানতে হবে। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশই শিক্ষা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে আপনাপন বৈশিষ্ট্য ধারণ করেই বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো জানা একটি নতুন দেশের জন্য অবশ্যকর্তব্য। পাকিস্তান আমলে সর্বপ্রথম চেষ্টা করা হয় আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে জানবার জন্য। এর ফলে কতকগুলো নতুন ডিসিপ্লিনের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। এরকম একটি বিষয় ছিল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বা সমাজকল্যাণ, আরেকটি বিষয় ছিল

www.pathagar.com

হোম ইকোনমিক্স বা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান। তাছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে আমেরিকার ইতিহাস পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং ইংরেজী বিভাগে আমেরিকার ইংরেজী সাহিত্য। আরও নতুন দু'টি বিষয় আমাদের শিক্ষাক্রমে যুক্ত হয়—একটি হল ব্যবসায় প্রশাসন আর একটি হল শিক্ষক প্রশিক্ষণ। এভাবে ক্রমশঃ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আমেরিকা থেকে পাওয়া নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করতে থাকি। অবশ্য আমাদের শিক্ষাক্রমের মৌলিক কাঠামোটা এখনও বৃটিশ শিক্ষার কাঠামো হিসেবেই রয়ে গেছে। আমাদের দেশে ফরাসী কিংবা জার্মান বা রুশীয় শিক্ষা ব্যবস্থাগুলো একেবারেই আসেনি। আসার কথাও নয় এবং আসা সম্ভবপর ছিল না। আমাদের দেশের তথাকথিত কমিউনিস্ট অথবা সমাজবাদীরা এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কখনও কোন চিন্তা করেনি। তারা বৃটিশ এবং অংশতঃ আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তাদের নতুন কোন অনুসন্ধান অথবা জিজ্ঞাসাও ছিল না। তারা শুধু ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এরা দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিশ্বাসহীনতার প্রেক্ষাপট নির্মাণের কৌশল করেছিলেন এবং এখনও করছেন।

একটি জাতির সংস্কৃতি জাতির অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। এই সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির জীবনধারা পদ্ধতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তাধারা, ঐতিহ্যকে ধারণ এবং মানুষ হিসেবে নিজেদের বোধের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ইচ্ছার বিকাশ। ধর্মীয় বিশ্বাসটি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই গ্রামাঞ্চলে থাকে। এই গ্রামাঞ্চলের মানুষগুলো ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে। ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা অথবা আমেরিকান শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুকূল না হলেও আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে এগুলো বিপর্যস্ত করতে পারেনি। কিন্তু আমাদের তথাকথিত সমাজবাদীরা আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সমূলে উৎপাটন করবার প্রয়াস পেয়েছে। এই প্রয়াসের ফলেই তারা কিছু ব্যঙ্গোক্তি নির্মাণ করেছে। এরকম একটি ব্যঙ্গোক্তি হচ্ছেঃ 'আজন্ম মার্কিনী'। কথাটি ব্যাকরণদুষ্ট এবং অর্থহীন। আমাদের দেশের কোন মানুষই জন্মসূত্রে 'মার্কিনী' নয় বা 'রুশী' নয়। বর্তমান কালে সকল দেশের সাথেই আমাদের যোগসূত্র স্থাপিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক সুযোগ লাভের জন্য এদেশের অনেক মানুষ মধ্যপ্রাচ্য যাচ্ছে, অনেকে আমেরিকায় যাচ্ছে, অনেকে ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে বাঁচবার প্রবণতাই এর কারণ।

www.pathagar.com

আমি আমার জন্মভূমিকে স্পর্শ করেই বেঁচে আছি। জাতি হিসেবে আমি আজন্ম বাঙালী এবং বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিচয়সূত্রে আমি বাংলাদেশী। এটাই আমার পরিচয় এবং এ পরিচয়টি স্বাভাবিক ও সত্য।

কিছুদিন আগে আবু জাফর শামসুদ্দিনের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থে গ্রন্থকার আমার নাম উল্লেখ করতে গিয়ে আমাকে 'আজন্ম মার্কিনী' বলেছেন। লেখক হয়ত ভেবেছিলেন, এই কথা বলে আমার চরিত্র হনন করা যাবে। ব্যাকরণদুষ্ট এই কথাটির কোন অর্থই হয় না। জন্মসূত্রে একজন বাংলাদেশের মানুষ কি করে মার্কিনী হয়, তা একমাত্র বিকারগ্রস্ত ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। সম্ভবত আমাকে অমর্যাদা করা লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। কেননা, কৃতজ্ঞতার বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য তার নিশ্চয়ই একটি প্রবল ব্যাকুলতা ছিল। কথাটা একটু স্পষ্ট করে বলি ঃ আমি যখন বাংলা একাডেমীর পরিচালক হিসেবে যোগ দেই, সেই সময় এই গ্রন্থকার অল্প বেতনে একটি বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনা করছিলেন। তিনি আমার কাছে এসে বাংলা একাডেমীতে চাকরি পাবার জন্য আবেদন জানান এবং তাকে আমি কোনরূপ দ্বিধা না করে বাংলা একাডেমীতে নিযুক্তি দেই। আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, একজন মানুষকে অর্থনৈতিক বিপদগ্রস্ততা থেকে রক্ষা করা। তাঁর কর্মকুশলতা সম্পর্কে আমার কোনই ধারণা ছিল না। আমি যতদিন বাংলা একাডেমীতে ছিলাম, ততদিন তিনি আমার সঙ্গেই ছিলেন। আমি যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম, তখন তিনি চট্টগ্রামে আমার সঙ্গে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁকে বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে নিযুক্তি দেই। চট্টগ্রাম থাকতে আমি বাংলা বিভাগের প্রধান ছাড়াও কলা অনুষদের ডীন ছিলাম। সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে রুশ ভাষা শিখবার জন্য একটি স্কলারশীপের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে আসে। ডীন হিসেবে আমি সে স্কলারশীপের জন্য উক্ত ভদ্রলোককে মনোনয়ন দেই। তিনি এই বৃত্তি পেয়েছিলেন। পরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপকের প্রার্থী যখন তিনি হয়েছিলেন, তখন নির্বাচনী কমিটিতে আমি বিশেষজ্ঞ ছিলাম। আমি তার মনোনয়ন সমর্থন করেছিলাম। সুতরাং বলা যায়, আমার চেষ্টায় এবং সমর্থনে জীবনক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়। এজন্য তার কাছ থেকে কোনদিন আমি কৃতজ্ঞতার দাবী করিনি। কিন্তু কোন প্রকার অসৌজন্য এবং অসদ্ভাবের প্রত্যাশাও করিনি। তার ক্ষেত্র এবং আমার ক্ষেত্র অভিন্ন নয়। তাকে সমালোচনা করবার কোন প্রয়োজন আমার কখনও হয়নি। আমার সহায়তায় কোন একজন মানুষের যদি উপকার হয়, তাহলে আমি তাতে আনন্দিত হয়ে থাকি। কিন্তু আমার ভাগ্যই এমন—যাদের আমি উপকার

www.pathagar.com

করেছি, তাদের অনেকেই কেন যেন আমাকে অপদস্ত করবার চেষ্টা করেছে। জীবনক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সংস্কৃতিক্ষেত্রে আমাদের দেশে উদার মানসিকতার বড় অভাব। যার ফলে আনন্দের অধিকার আমরা লাভ করি না এবং সহিষ্ণুতা ও সমৃদ্ধি আমাদের স্পর্শও করে না।

আবু জাফর শামসুদ্দীনকেও তাঁর আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক বিপর্যয় থেকে আমি রক্ষা করেছিলাম। আমি যখন বাংলা একাডেমীতে এসে যোগ দেই, তখন তিনি লেখক সংঘে অসম্ভব অল্প বেতনে কাজ করছিলেন। তিনি আমার কাছে এসে সাহায্য চান এবং বাংলা একাডেমীতে একটি উপযুক্ত কর্মে নিযুক্তি দিতে বলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে কোন কমিটির অনুমোদন ছাড়াই, অনুবাদ বিভাগে তাঁকে পরিচালক হিসেবে নিযুক্তি দেই। তিনি এই কর্মে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। পরবর্তীতে তিনি তার রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান সত্য, কিন্তু তিনি তাঁর 'জীবন কথা'য় আমার প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করেছিলেন।

ইসলামে বলে যে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার উপকারী এবং সম্মান প্রদানকারীকে বিনয়াবনত অঙ্গীকারে গ্রহণ করা। যদি কেউ তা না করে, তাহলে সে তার আত্মাকে অবমাননা করে এবং বিশ্বাসীদের গোত্র থেকে বেরিয়ে যায়। জীবনের স্বল্পকালীনতার বিস্তারের মধ্যে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সময়কে এমনভাবে গ্রহণ করা যাতে তার মধ্যে গ্লানি প্রবেশ না করতে পারে। যদি সময়ের মধ্যে গ্লানি প্রবেশ করলই, তাহলে সময়ের মূল্য তো থাকে না। একজন সূফীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—জীবন কি? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, জীবন হচ্ছে সময়। পৃথিবীতে আমরা সময়ের মধ্যে বাস করি। এই সময়কে পরিচ্ছন্ন রাখা, ঔদার্যে পরিপূর্ণ রাখা এবং আনন্দের অনাবিলতায় স্বচ্ছল রাখা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু সময়কে যদি আমরা ঘৃণায়, ঈর্ষায় এবং অকৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ করি, তাহলে জীবনে আমরা কিছু তো পাব না। রাজনীতি হচ্ছে মানুষের খণ্ডকালীন জীবনের একটি পার্থিব কর্মতৎপরতা। যদি এই রাজনৈতিক বিশ্বাস কাউকে অমানুষ করে এবং সত্য থেকে সরিয়ে আনে, তাহলে জীবনে সে কিছুই তো পেল না। সে তার মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে একটি সর্বনাশের জন্ম দিল।

একজন বিদেশী কবি লিখেছেন, 'আমি যদি নিজেকে সত্যের কাছে অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় সমর্পণ করতে পারি, তাহলেই স্বর্গীয়ভাবে আমি উন্নতির সোপানে আরোহণ করব।' কবি 'divinely elevated' কথাটা বলেছেন।

www.pathagar.com

আমি চাই মানুষ সত্যকে গ্রহণ করে জীবনে শান্তিকে আবিষ্কার করুক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের দিক থেকে প্রয়োজন থাকে এবং পৃথিবীর দিক থেকে থাকে আয়োজন, সেই আয়োজন থেকে গ্রহণ করে আমরা পরিপূর্ণ হই। তাই পৃথিবীর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নাই।

www.pathagar.com

আমাদের সংস্কৃতি

ইউনেস্কোর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল দীর্ঘদিনের। আমি যখন করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম তখন ১৯৫৫ সালে জুন কি জুলাই মাসে কৃপাল বলে ইউনেস্কোর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা করাচীতে এসেছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে এবং ব্যবস্থাপনায় ইউনেস্কোর পাকিস্তান জাতীয় কাউন্সিল গঠিত হয়। কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হন ডঃ মাহমুদ হোসেইন এবং সদস্য হিসেবে যাঁরা গৃহীত হন তাঁরা ছিলেন, শিক্ষা উপদেষ্টা এস. এম. শরীফ, মমতাজ হাসান, আখতার হোসেন রায়পুরী। আরও কয়েকজন ছিলেন তাঁদের নাম আমার মনে পড়ছে না। আমাকে সদস্য-সচিব নিযুক্ত করা হয়েছিল। সূত্রপাতের এই ঘটনাটুকু উল্লেখযোগ্য। পরে ইউনেস্কোর উদ্যোগে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র যখন প্রতিষ্ঠা হয়, তখন আমি তার একজন উপদেষ্টা নিযুক্ত হই। এরপর আমি ইউনেস্কোর বিভিন্ন এশীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করতে থাকি। ১৯৬০ সালে ঢাকায় চলে আসার পর শ্রীলংকায়, করাচীতে এবং তেহরানে পুস্তক প্রকাশনা বিষয়ে যেসব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করি। তেহরান সম্মেলনে 'রিসোর্স পারসন' হিসেবে যোগদান করেছিলাম। ১৯৬৬ সালের মে মাসে ইউনেস্কো কর্তৃক আমি সম্মানিত হই এবং ইউনেস্কো সচিবালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে টোকিওতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেই।

ইউনেস্কো পৃথিবীর সকল সদস্য দেশের জন্য অনেক কল্যাণমুখী কাজে হাত দিয়েছে। এর মধ্যে আমার বিচারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সদস্য দেশসমূহের সংস্কৃতির পরিচয় এবং রূপরেখা নির্ণয়। ১৯৮২ সালে মেক্সিকোতে ইউনেস্কোর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক নীতিমালা চিহ্নিত করবার চেষ্টা করা হয়। সম্মেলনে সংস্কৃতির একটি সংজ্ঞাও নির্ধারণ করা হয়। সেখানে বলা হয় ঃ

'ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির অথবা সামাজিক গোত্রের বিশিষ্টার্থক আত্মিক, বস্তুগত, বুদ্ধিগত, আবেগগত চিহ্ন এবং কর্মধারার প্রকাশ। শিল্প ও সাহিত্য একটি মাত্র সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বস্তু

www.pathagar.com

নয়, মানুষের জীবনধারাও সংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের অধিকার, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসও সংস্কৃতির অঙ্গ।'

'সংস্কৃতি মানুষকে নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার অধিকার এবং ক্ষমতা প্রদান করে। আমরা যে বিশেষভাবে যুক্তিবাদী মানুষ, যে মানুষের বিচার-বুদ্ধি আছে এবং ন্যায়ের প্রতি আনুগত্য আছে তা আমরা অনুভব করতে পারি সংস্কৃতির মাধ্যমে। সংস্কৃতির মাধ্যমেই আমরা মূল্য নিরূপণ করি এবং ভাল-মন্দের মধ্যে নির্বাচন করতে শিখি। সংস্কৃতির মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে, আত্মসচেতন হয়, নিজের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে বোধ জন্মে, নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বোধ জন্মে, নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শেখে, অনবরত নিজের সীমা অতিক্রম করে দক্ষতা অর্জন করে।'

মেক্সিকো সম্মেলনে সাংস্কৃতিক আইডেনটিটিবহ অভিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। এই ব্যাখ্যা তৈরির ব্যাপারে ভারতের প্রতিনিধি ডঃ কপিলা বাৎসায়ন মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ব্যাখ্যাগুলো নিম্নরূপঃ

১. প্রত্যেক সংস্কৃতি জাতিসত্তার ঐতিহ্যকে প্রকাশ করে। প্রত্যেক জাতি তার সংস্কৃতির মাধ্যমে পৃথিবীতে তার উপস্থিতিকে সুচিহ্নিত করে।

২. সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের সুনিশ্চয়তার মাধ্যমে একটি জাতি তার স্বাধীন বোধকে প্রমাণিত করে, অপরপক্ষে বিরোধী সংস্কৃতির আগ্রাসন জাতিসত্তার অভিজ্ঞানকে ধ্বংস করে।

৩. সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তার অতীতকে আবিষ্কার করে, অতীতের প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ হয় এবং বাইরের পৃথিবীর কাছ থেকে কল্যাণপ্রদ বস্তু গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়। একটি জাতি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকেই শুভ ও কল্যাণকে গ্রহণ করে সৃষ্টিধর্মিতার মধ্যে অগ্রসর হতে পারে।

৪. পৃথিবীর সকল প্রকার সংস্কৃতিই মানব জাতির ঐতিহ্য। একটি জাতির সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান বলিষ্ঠ ও তাৎপর্যবহ হয় বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে। সংস্কৃতি এক প্রকার সংলাপের মত। সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি সমৃদ্ধমান হয়, বিনিময় না থাকলে যে কোন সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৫. কোন একটি একক সংস্কৃতি তার সার্বজনীনতা স্বীকৃত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পৃথিবীর অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়তেই হবে এবং এ সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে সে তার নিজের অস্তিত্ব প্রমাণিত করবে। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

www.pathagar.com

৬. বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না, বরঞ্চ আদান-প্রদান সহজ ও সুন্দর হয়। সংস্কৃতির বহুবচনতা যাকে আমরা ইংরেজীতে বলি প্লুরালিজম বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করেই তৈরি হয়ে থাকে।

৭. মানুষের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতিকে সম্মান এবং সংরক্ষণ করা।

৮. একটি জাতির সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং অভিজ্ঞান সংস্কৃতির দ্বারাই চিহ্নিত হয়। মনে রাখতে হবে সংস্কৃতির মাধ্যমে আত্মিক, মানসিক এবং পার্থিব ইচ্ছার বিকাশ ঘটে থাকে। যথার্থ উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষের কল্যাণ। মনে রাখতে হবে, সকল উন্নয়নের মূলে রয়েছে মানুষ। সুতরাং কোন দেশের জন্য সাংস্কৃতিক নীতি-নির্ধারণ করতে গেলে সে দেশের মানুষের আশা-আকাংক্ষাকে এবং জীবন যাপনের ব্যবস্থাকে সম্মান করতে হবে।

৯. সংস্কৃতি জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয় এবং জনগোষ্ঠীর কাছেই প্রত্যাবর্তন করে। সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা, অধিকার সকল শ্রেণীর মানুষেই পাবে, কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষ নয়। সুতরাং, সকল মানুষ যাতে সংস্কৃতির সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে সে কারণে সকলের জন্য শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করতে হবে এবং সকলকেই সমান সুযোগের অধিকার দিতে হবে।

১০. একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে যে সমস্ত বিষয় গণ্য হবে তা হচ্ছে শিল্পীদের শিল্প সংস্কৃতি, সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনা, স্থপতিদের নির্মাণকর্ম, সঙ্গীতশিল্পীদের সঙ্গীত, নৃত্য শিল্পীদের নৃত্য ব্যঞ্জনা, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার এবং অনুসন্ধান কর্ম, মানুষের ধর্মবোধ এবং সেই সমস্ত মূল্যবোধের সুকৃতি যা জীবনকে অর্থদান করে। অধিগম্য এবং অনধিগম্য সকল কর্ম, মানুষের ভাবপ্রকাশের ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি, বিশ্বাস, ঐতিহাসিক নিদর্শন, নৃতত্ত্ব, গ্রন্থাগার-সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

১১. পৃথিবীতে বহু দেশে অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে বহু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির অপরিকল্পিত প্রয়োগের ফলে সংস্কৃতিতে আঘাত লেগেছে। আবার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঔপনিবেশিকতা, বৈদেশিক প্রভাব সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করে। সুতরাং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি দেশ তার স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে।

www.pathagar.com

১৯৮৩ সালে আমার জীবনে প্রচণ্ড পরিবর্তন আসে। দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর আমার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। আমি কর্মের প্রতি আসক্তি হারিয়ে ফেলি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবন থেকে স্থায়ীভাবে অবসর গ্রহণ করি এবং কিছুকালের জন্য নিউইয়র্কে আমার বড় মেয়ের সঙ্গে বসবাস করতে থাকি। '৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশে ফিরে আসি। দেশে ফিরে এসে বিভিন্ন উপলক্ষে নানা জায়গায় সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেই। আমি ভাবতে থাকি যে, বাংলাদেশে আমাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা প্রয়োজন। যুগ যুগ ধরে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বলে যা চলে এসেছে, তার যথার্থ পরিচয় কি—তা জানা প্রয়োজন। বহির্বিশ্ব এবং নিজস্ব বিশ্ব এ দু'য়ের সমন্বয়ে আমরা বাস করি। নিজস্ব বিশ্ব হচ্ছে নিজস্ব দেশগত বিশ্ব। পাশ্চাত্য জগৎ, প্রাচ্য জগৎ এবং মুসলিম জগৎ—এই তিনটি জগতের সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের আদান-প্রদানের প্রয়োজন। এই আদান-প্রদানের মাধ্যমে সংস্কৃতিগতভাবে আমরা লাভবান হব। এবং আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আমরা সমৃদ্ধ করতে পারব। পৃথিবীর সকল দেশেই একক সাংস্কৃতিক অনুসন্ধান চলছে এবং ইউনেস্কো সেই অনুসন্ধানে সাহায্য করছে। এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে সক্ষম হব, আবার সঙ্গে সঙ্গে আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেদেরকে বর্তমান বিশ্বের সমকালীন করতে পারব। আমরা বর্তমানে যে পৃথিবীতে বাস করছি সে পৃথিবী দ্রুতভাবে আদান-প্রদানের দিক থেকে সংকুচিত হয়ে পড়ছে অর্থাৎ আমরা একে অন্যের খুবই নিকটবর্তী হয়ে পড়ছি। এই নিকটবর্তিতা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আমাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে সুচিহ্নিত করতে পারি।

দীর্ঘকাল পর ১৯৮৮ সালের জুন মাসে আমি বাংলাদেশ সরকারের নিকট আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক রূপরেখা নির্ধারণের জন্য একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেই। কমিশনের কর্ম-পরিধিও আমি নির্ধারণ করে দেই। সরকার আমার প্রস্তাবটি গ্রহণ করে এবং আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের সামগ্রিক পরিচয়, বর্তমান চাহিদা ও উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ বিকাশের লক্ষ্যে যথার্থ দিক নির্দেশনা, কর্মসূচী প্রণয়ন ও সুপারিশমালা পেশ করবার জন্য আমাকে চেয়ারম্যান করে ২৫শে আগস্ট, ১৯৮৮ সালে একটি কমিশন গঠনের ঘোষণা দেয়।

মানুষের সমাজ এবং সংস্কৃতি একই সঙ্গে বিকাশ লাভ করে। অর্থাৎ মানুষের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমাজের এবং সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটতে থাকে। এরা একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

www.pathagar.com

এককভাবে কারোরই উদ্ভব সম্ভবপর নয়। মানুষ সংস্কৃতি নির্মাণ করে এবং সংস্কৃতির উপাদানগুলোকে আহরণ করে। মানুষ প্রথমে সমাজে বাসের উপযুক্ত হয় এবং সংস্কৃতিকে ব্যবহার করতে শেখে। এখানে কিছুটা সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান অর্থাৎ সংস্কৃতির কতটা গ্রহণ করতে পারবে অথবা সংস্কৃতিকে কিভাবে নির্মাণ করতে পারবে তার উপরই নির্ভর করছে একটি সংস্কৃতির সমৃদ্ধি। মানুষ কর্মক্ষম হয় এবং সংস্কৃতিকে ব্যবহার করতে শেখে। এই ব্যবহারের ফলে মানুষ তার সমাজকে নির্মাণ এবং সমৃদ্ধ করে। আমরা আমাদের দেশের প্রাগৈতিহাসিককালের সুস্পষ্ট ইতিহাস জানি না, কিন্তু এটা জানি যে, এতদঞ্চলের মানুষ ভিন্নতর সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। আর্যরা ভারতবর্ষে আগমন করেছিল একটি নতুন সংস্কৃতি নিয়ে। সমগ্র উত্তর ভারত তাদের করায়ত্ত হয়েছিল। তাদের প্রভাব ও অহমিকায় ভারতবর্ষে একটি নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল। তারা আনুগত্যের আহবান জানিয়েছিল সকল জাতিকে এবং মানবগোষ্ঠীকে। যে জাতি তাদের এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা বঙ্গজাতি। এই প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে একটি দুর্দান্ত সাহস আমরা লক্ষ্য করি। আমাদের সংস্কৃতির উৎসমূলে বিজাতীয় সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেন তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, সে ইতিহাস আমাদের জানা নেই, তবে আমরা অনুভব করতে পারি যে, আপন অঞ্চলের ভৌগলিক সীমাবন্ধনকে অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য তারা নিজস্ব সত্তার মধ্যে নিমজ্জিত থাকতে চেয়েছিল; যার ফলে এ অঞ্চলের সমাজ বন্ধন এবং ভাষার বিকাশ আর্যাবর্তের অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে ভিন্নতর হয়েছিল। এই ভিন্নতা সব সময় রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি, কিন্তু যতটা সম্ভব, আপন স্বকীয়তা বজায় রাখার চেষ্টায় এতদঞ্চলের মানুষ অনেকটা সফলকাম হয়েছিল।

একটি সংস্কৃতিতে বিবিধ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। এই লক্ষণগুলো সৃষ্টি হয় সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমে। আর্যদের আগমনের সময়ে বঙ্গভূমির লোকেরা আপন সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকবার চেষ্টা করলেও পরবর্তীতে এ অঞ্চলের সংস্কৃতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। পালদের আমলে বঙ্গ সংস্কৃতির ভূখণ্ড বিস্তৃতি লাভ করে। এই বিস্তারের ফলে ভৌগলিক সীমারেখা ভেঙ্গে যায় এবং জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে এ অঞ্চলের সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা অর্জিত হতে থাকে। আমরা জানি, মানুষের অর্জিত আচরণ সংস্কৃতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। দু'টি ভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ে একটি নতুন সংস্কৃতি জন্মলাভ করতে পারে। বঙ্গবাসীরা তিব্বতে গিয়েছে, ব্রহ্মদেশে গিয়েছে, উত্তর ও পশ্চিম ভারতে নিজেদের প্রভাব বলয় বিস্তার করেছে। এর সাহায্যে অন্য সংস্কৃতিকে তারা দিয়েছেও যেমন, নিজেরাও অর্জন করেছে

www.pathagar.com

অনেক কিছু। এভাবে বলতে পারি, বিভিন্ন প্রলক্ষণ সমন্বিত হয়ে সেই প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির রূপরেখা নির্মিত হয়েছিল। বিশেষ করে এতদঞ্চলের চিত্রকলার কথা আলোচনা করা যায়। বঙ্গের চিত্রকলার বিশেষ কতকগুলো প্রলক্ষণ ছিল। সেগুলো পশ্চিম ভারত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং উত্তরে নেপাল ও তিব্বতের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। এই ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চিত্র পদ্ধতিতে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয় এবং নতুন অর্জিত কৌশলে ক্রমশঃ এর রূপের পরিবর্তন হতে থাকে। আমরা যদি এ চিত্রকলার রং-এর ব্যবহার এবং আকৃতির গঠনতন্ত্র পরীক্ষা করি, তাহলে দেখব যে, প্রাথমিক রূপ থেকে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে এই চিত্রকলা নতুন শোভা ও প্রতাপের অধিকারী হয়েছে। এখানে বলবার কথা এই যে, একটি সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির প্রবল গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে এটা সত্য। কিন্তু আবার নিজেই যখন অন্য সংস্কৃতির দিকে প্রভাবিত হয়, তখন তা নতুন নতুন প্রলক্ষণ অর্জন করে। প্রাচীনকালের বঙ্গ সংস্কৃতিও নিজস্ব উৎসকে রক্ষা করেই বাইরের প্রভাবকে স্বকীয় করেছে এবং আপন সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছে।

ইউনেস্কোর নির্দেশে বিভিন্ন দেশ তাদের সাংস্কৃতিক রূপরেখা চিহ্নিতকরণের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে। ভারতে এই ব্যবস্থাপনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডঃ কপিলা বাৎসায়ন। এই মহিলা একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ এবং নৃতত্ত্ববিদ। তিনি ভারতের বিখ্যাত হিন্দী কবি বাৎসায়নের পত্নী ছিলেন। ডঃ কপিলার রিপোর্টটি আমার কাছে ছিল। ফরাসী দেশের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ফরাসী সাংস্কৃতিক রূপরেখা সংক্রান্ত একটি পুস্তিকাও আমার কাছে ছিল। তদুপরি মেক্সিকোর রিপোর্ট তো ছিলই। এসব কিছু পর্যালোচনা করে এবং বাংলাদেশের ইতিহাসের ধারা অনুসন্ধান করে আমি একটি আদর্শ রিপোর্ট তৈরি করবার প্রস্তুতি যখন নিচ্ছিলাম, তখন অকস্মাৎ কিছুসংখ্যক লোক বিবৃতি প্রদান করে জাতীয় সংস্কৃতি কমিশনকে বাতিল করবার চেষ্টা করে। এই বিবৃতি প্রদানকারীরা মেক্সিকোর ইউনেস্কো সম্মেলন সম্পর্কে জানতেন না, তারা আরও জানতেন না যে, এটা এক ধরনের একাডেমিক অনুসন্ধান যা পৃথিবীর সকল দেশেই হয়ে থাকে। তৃতীয়তঃ কমিশন কি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, তা কমিশনের সদস্যরাই জানতেন না। সুতরাং সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পূর্বাহ্নে বক্তব্য প্রদান করা হাস্যকর এবং ন্যাক্কারজনক। যাই হোক, এ সমস্ত বক্তব্য বিবৃতিতে আমি মোটেই বিব্রত হইনি, বরঞ্চ কিছু সংখ্যক মানুষের রুচি বিকৃতিতে দুঃখ পেয়েছিলাম।

www.pathagar.com

এদেশের সাংস্কৃতিক রূপরেখা চিহ্নিত করবার জন্য এদেশের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, বঙ্গ অঞ্চল অতীতে আপন স্বাতন্ত্র্যে ও নিজস্ব সত্ত্বায় বিদ্যমান থাকতে চেয়েছে। বাংলাদেশের অতীত নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন এজন্য যে, প্রায় সকল আলোচনায় এই সময়কালটিকে অগ্রাহ্য করা হয় অথবা তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। আমরা দেখেছি যে, বাংলাদেশের অতীত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং প্রজ্ঞাপিত। এর মধ্যে মোটামুটি তিনটি যুগ আমরা পাই, একটি হচ্ছে পাল পূর্ব যুগ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে পাল যুগ এবং তৃতীয়টি হচ্ছে সেন যুগ। অবশ্য পাল যুগে চন্দ্রদের কথাও স্মরণে রাখতে হবে। বাংলার সংস্কৃতি নির্মাণে পালপূর্ব যুগের তেমন কোন ভূমিকা নেই। কেননা, এ সময়ে দেশে বিশৃংখলা বিরাজমান ছিল এবং বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আর্যপ্রভাব অস্বীকারের প্রবণতা ছিল। আর্যরা জাতিভেদ প্রথা প্রচলন করেছিলেন, স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন এবং গণতন্ত্রের অধিকার লুপ্ত করেছিলেন। আর্যদের সময়ের জাতিভেদ এ অঞ্চলে দানা বাঁধতে পারেনি। এদেশের মানুষ জাতি পরিবর্তনের এক বিস্ময়কর নমুনা রেখে গেছে। এ অঞ্চলের মানুষ ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র হয়েছে, আবার শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে। ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী তাঁর 'জাতিভেদ' গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ সমস্ত কারণে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ধারণ করতে পাল যুগকে আমাদের বিবেচনায় আনা বিশেষ প্রয়োজন।

পাল যুগটি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়কালে জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন ঘটে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়, গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন ঘোষিত হয়, বিস্ময়কর চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য এ অঞ্চলে গড়ে ওঠে, সর্বোপরি, বৌদ্ধ বিনয়, তৃষ্ণাহীনতা, সাম্য এবং সমতার একটি আদর্শ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উপরে ছিল ভাষা। জনসাধারণের সহজাত আনন্দ এবং আগ্রহকে বহমান করবার জন্য একটি পূর্ব অপভ্রংশ এখানে গড়ে উঠেছিল। এই জনসাধারণের ভাষা এখানকার সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হয়েছিল। অর্থাৎ এক কথায়, এ অঞ্চলের মানুষের মানসপ্রক্রিয়া গঠনের জন্য একটি মার্জিত রুচির সংস্কৃতি এখানে গড়ে উঠেছিল। ভাষা সংস্কৃতিকে ধারণ করে এবং তাকে বহমান এবং প্রকাশিত রাখে। এ সময়কার দোহা-বন্ধগুলো এবং গীত-বন্ধগুলো এখানকার সংস্কৃতিকে রূপ দিয়েছে এবং সজীব করেছে। বাংলাদেশের পরবর্তীকালের সংস্কৃতিকে অনুভব করতে হলে পাল রাজত্বকালের সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করতে হবে। চন্দ্রদের সময়েও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

পালদের পরে বহিরাগত সেনরা এসে এদেশকে নিজেদের অধিকারে রেখেছিল। খুব দীর্ঘকাল না হলেও প্রায় পঁচাত্তর বৎসর তারা এ অঞ্চল শাসন করেছিল। এখানকার মানুষকে ধর্মচ্যুত করবার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল এবং কর্নাটক ও কর্ণকুব্জ থেকে সংস্কৃতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ এনে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করেছে। অত্যন্ত নিষ্ঠুর আকারে জাতিভেদ প্রথা পরিবর্তন করে এবং বৌদ্ধদের উৎখাত করার চেষ্টায় সকল শক্তি নিয়োগ করে তারা যে কঠোরতার নিদর্শন রেখে গেছে, তা বাংলা সংস্কৃতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এক্ষেত্রে যে প্রভাবটি প্রচণ্ড এবং প্রবলভাবে অভিব্যক্ত তা হচ্ছে, কবি জয়দেবের ললিতমধুর কাব্য 'গীত গোবিন্দ'। জয়দেব শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিধারার মাঙ্গলিক গান রচনা করলেন এবং এর প্রভাব বাঙালী জীবনে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। জয়দেবের সঙ্গীত পরবর্তীতে বৈষ্ণব সঙ্গীতের জন্ম দেয় এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাঙালী সমাজে তা সম্মোহন বিস্তার করে। নৃত্যের ক্ষেত্রে জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ' উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতের 'ভরত নাট্যম' জয়দেবের সঙ্গীতের প্রেক্ষাপটে সমৃদ্ধি লাভ করে।

অল্প সময়ের মধ্যে সেন রাজাদের শাসনকালে রাজ দরবারের গৃহীত নীতি হিসেবে, সংস্কৃত উচ্চবিত্তদের আসরে স্থান লাভ করে। রাজ দরবারে সংস্কৃত ভাষার কবি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের স্থান হয় এবং রাজ আনুকূল্যে একটি সম্ভ্রান্ত এবং সচেতন সংস্কৃতি এদেশের উপর আরোপিত হয়। আরোপিত সংস্কৃতি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে বেশি। কিন্তু হারিয়ে গেলেও কিছুটা রেশ যে রেখে যায় না, তা নয়। একটি বিশেষ কারণে এই রেশ বিদ্যমান ছিল। জয়দেব যে সংস্কৃত ভাষায় তার কাব্য রচনা করেছিলেন তার ভঙ্গি ছিল সহজবোধ্য এবং আকর্ষণীয়। জয়দেবের কাব্যের ললিত তরল ভঙ্গি জনসমাজে সম্মোহন সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। একে তো রাজ-আনুকূল্য এবং প্রচারণা বিদ্যমান ছিল, তদুপরি, জয়দেবের নিজস্ব নাগরিক কৃতি এবং কৌশল তাকে জনসমর্থনের সুযোগ এনে দিয়েছিল। তাঁর 'গীত গোবিন্দ'কে অবলম্বন করে এ অঞ্চলে ধ্রুপদী সঙ্গীত এবং নৃত্যের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হয়। এগুলোর নিদর্শন পরবর্তীতে হারিয়ে গেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এক সময় যে ছিল, তা ধারণা করা যায়। জয়দেবের প্রভাব পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিল, যেমন উড়িষ্যায় ওড়িষী নৃত্য। বঙ্গ অঞ্চলে মনিপুরী নৃত্য, জয়দেবের প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে রাজনৈতিক কারণে সেন রাজাদের অবক্ষয় ঘটে এবং ইখতিয়ারউদ্দিন বখতিয়ার খিলজীর আগমনের পর সেনদের প্রভাব ক্রমশঃ মুছে যেতে থাকে।

www.pathagar.com

বখতিয়ার খিলজী একটি নতুন বিশ্বাস এবং চৈতন্য বঙ্গ অঞ্চলে নিয়ে আসেন যার সঙ্গে এই ভূখণ্ডের লোকদের ঘনিষ্ঠ কোন পরিচয় ছিল না। এদেশে মুসলমানরা এসেছে পূর্বেই, কিন্তু ব্যাপকভাবে তাদের প্রভাব অনুভূত হয়নি। এই প্রথমবার একটি সম্পূর্ণ নতুন সভ্যতার সঙ্গে বঙ্গবাসীর পরিচয় হল। মুসলমানদের আগমনের ফলে এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন মাত্রা সংযোজিত হল। একটি নতুন স্থাপত্যরীতি এদেশে গড়ে উঠল যা দৃশ্যতঃ শোভন এবং ব্যবহার উপযোগিতার আদর্শ স্থল। সারা দেশে মসজিদ নির্মিত হতে লাগল এবং মসজিদের গঠন প্রণালী একটি নতুন স্থাপত্য রীতির প্রবর্তন করল।

এভাবে ইতিহাসের ধারাক্রম অনুসরণ করে সংস্কৃতি কমিশনের রিপোর্টে এ সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছি যে, বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি নিজস্ব বলয় আছে এবং এই বলয় বাংলাদেশের এলাকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও বিশ্ববোধের সঙ্গে তা যুক্ত। যে নীতিমালা আমরা চিহ্নিত করেছিলাম তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

১. আমাদের আবহমান ঐতিহ্যের অনুসরণ, জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচেতনার অনুষঙ্গরূপে প্রাপ্ত নৈতিক চেতনাকে সমুন্নত রাখার প্রয়াস।

২. ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত বাংলাদেশের মানুষের মানবতাবোধের সঙ্গে বিশ্ববোধের ঐক্যসাধন।

৩. আমাদের লিখিত-অলিখিত সুদীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মহান আদর্শ যাতে জাতীয় জীবনে অবিনশ্বর রূপ লাভ করে তার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. জাতীয় জীবনে সহনশীলতার ভাবধারাকে জোরদার করে কার্যকর গণতান্ত্রিক বোধের বিকাশ সাধন, বিদেশী সংস্কৃতির সংস্কৃতি গ্রহণ ও অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।

৫. সর্ববিধ উপায়ে জাতীয় সংস্কৃতির অবক্ষয় রোধ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন।

৬. বাংলাদেশে বিদ্যমান সকল ধর্মাবলম্বীদের ধর্মচর্চা ও অনুষঙ্গী কার্যক্রম পরিকল্পনার ও বাস্তবায়নের অবাধ সুযোগ রয়েছে এবং থাকবে। তবে কোন বিশেষ সম্প্রদায়েরই এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে যার দ্বারা অন্য সম্প্রদায়ের মানসিকতা আহত হবার সম্ভাবনা থাকে। সাম্প্রদায়িকতাশূন্য বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সম্প্রীতি পরিপূরক কার্যক্রমের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

সকল দিক বিবেচনা করলে অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি কমিশনের রিপোর্টের তুলনায় বাংলাদেশের কমিশনের রিপোর্ট অনেক উন্নতমানের এবং

www.pathagar.com

অনেক বিস্তৃত হয়েছে। আমরা রিপোর্টকে সমৃদ্ধ করবার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির রূপরেখা জানবার জন্য ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, জাপান, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিশনের কয়েকজন সদস্যকে প্রেরণ করি। তাঁদের সংগৃহীত উপকরণ এবং অভিজ্ঞতা আমাদের প্রতিবেদনে যথাসম্ভব সমন্বিত করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, সংস্কৃতি কমিশনের বিরুদ্ধে কেউ কেউ দুর্ভাগ্যজনক মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে কমিশনকে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন। কমিশনের সদস্য হয়ে এবং কমিশনের কার্যবিধিতে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করেও এবং চূড়ান্ত রিপোর্টে স্বাক্ষর প্রদান করেও পরবর্তীতে কোন একজন সদস্য রিপোর্টের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছিলেন। এটা মর্মান্তিক নীতিবিগর্হিত কাজ। তবে যাই হোক, একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমি করতে পেরেছি – সেজন্য আমি আনন্দিত এবং আমি বিশ্বাস করি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে একদিন তা উল্লেখযোগ্য বলে চিহ্নিত হবে।

www.pathagar.com

আমার জীবনে আমি

আমি চিরকাল পরিবর্তনের প্রত্যাশী। যা আছে তাই নিয়ে আমি সন্তুষ্ট নই। সব সময় ভেবেছি যে, যা আছে তাকে অনুসরণ করলে আমি নিজস্ব কিছু উপস্থিত করতে পারব না। ছোট বয়সে অবশ্য পিতামাতার নির্দেশেই বড় হয়ে উঠেছি, কিন্তু তখনও হারিয়ে যাবার বাসনা হত। যা পাবার তা নিয়ে সন্তুষ্ট থেকে, যা পাবার নয়, তা খোঁজবার ইচ্ছে হত। এভাবেই একদিন শৈশবে ডিঙ্গি নৌকোয় ভেসে গিয়েছিলাম। আমি শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথের মত ছিলাম না। ইন্দ্রনাথের ছিল সবকিছু অস্বীকার করার প্রবণতা, গৃহ ফেলে বেরিয়ে পড়া এবং উদ্দাম জীবনকে মান্য করা। আমার প্রকাশ্যে প্রতিবাদের প্রবণতা ছিল না, কিন্তু নতুন কিছু করবার ইচ্ছে হত। কথাটা আরেকটু স্পষ্ট করে এভাবে বোঝাতে পারি যে, চিরাচরিত জীবনধারার প্রতি আমার বিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু তার মধ্যে নতুন কিছু আনবার একটি ইচ্ছে হত। আমার মা বলতেন যে, আমি নাকি অনেকটা আমার মামার মত ছিলাম। আমার মামা বেশিদিন বাঁচেন নি। চৌদ্দ কিংবা ষোল বছর বয়সে তার মৃত্যু ঘটে। তিনি সংসারে গুরুজনদের অধিকার এবং প্রাধান্য নিয়ে কখনও প্রশ্ন তুলতেন না, কিন্তু তার মধ্য দিয়েই তিনি কখনও কখনও ব্যতিক্রম বের করে নিতেন। সুযোগ পেলেই জঙ্গলের মধ্যে চলে যেতেন এবং সেখানকার ফলমূল খেতেন। কি ফল খাওয়া যেতে পারে সেটা বুঝবার সহজাত একটি প্রবৃত্তি তার ছিল। মার কাছে শুনেছি যে, তিনি কোনদিন ভাত খেতেন না, শৈশব থেকেই ভাতের প্রতি তার বিতৃষ্ণা ছিল, তিনি রুটি এবং গোশ্‌ত খেতেন। প্রতিদিনকার জীবনধারার মধ্যে তাঁর এই ব্যতিক্রমী দিকটি সবার মনে কৌতূহল সৃষ্টি করত। কিন্তু যেহেতু তিনি সমাজ এবং সংসারের কার্যকারণের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেন নি তাই সবাই তার ব্যতিক্রমকে পছন্দ না করলেও সহ্য করত। আমি অবশ্য আমার মামার মত প্রাত্যহিক জীবনে পরিবর্তনের প্রয়াসী ছিলাম না, আমি একটি নতুনত্বের প্রত্যাশী ছিলাম। ভাবতাম যা আছে তাতো আছেই, কিন্তু তার মধ্যে নতুনত্ব কিছু আনা যায় কিনা তা চেষ্টা করা যেতে পারে। বড় হলে ক্রমশঃ এই নতুনত্বের প্রত্যাশা আমার কর্মজীবনে প্রভাব বিস্তার করল এবং আমাকে ব্যতিব্যস্ত রাখল।

www.pathagar.com

রাশিয়ার এক উপন্যাস পড়েছিলাম। উপন্যাসটির নাম 'নট বাই ব্রেড এলোন' অর্থাৎ শুধু ক্ষুধা নিবৃত্তিতে সব সমস্যার সমাধান হয় না। ক্রুশ্চেভের আমলে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থের নায়ক এক প্রকৌশলী। সে বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলত ঠিকই কিন্তু তার মধ্যেও সে ভাবত যে নতুন কিছু করা যায় কিনা। সে একটি ফার্মে কাজ করত, যে ফার্মের কাজ ছিল লোহার পাইপ তৈরি করা। একটি যন্ত্রের মধ্যে গলিত লোহা ঠেলে দেয়া হত এবং অপরপ্রান্ত দিয়ে একটি বিশেষ মাপের ও পরিধির পাইপ বেরিয়ে আসত। ঘন্টায় কতটা করে পাইপ বেরুবে তার একটা হিসেব ছিল। গ্রন্থের নায়ক ভাবতে লাগল এমন একটি যন্ত্র কি তৈরি করা যায় না, যার মাধ্যমে বর্তমানে ঘন্টায় যে ক'টি পাইপ বেরোয় তার দ্বিগুণ কিংবা তিনগুণ পাইপ বেরোবে। সে বাড়িতে বসে একটি নতুন যন্ত্রের নীল নক্শা তৈরি করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই যন্ত্র তৈরির সুযোগ সে পেল না, সে একটি গতানুগতিক ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল বলে চাকরি হারাল। তার অপরাধ ছিল যে, সে নতুন কিছু করবার চিন্তা করেছিল যে চিন্তা করবার অধিকার তার ছিল না। আমি গল্পটা বললাম একারণে যে, আমাদের জীবনেও নতুন কিছু করবার প্রবণতা অনেকের ক্ষেত্রে অংকুরেই বিনষ্ট হয়। আমার ক্ষেত্রে অবশ্য তা হয়নি। কিন্তু যেটা হয়েছে তাহল স্বীকৃতির অভাব। তবু আমি সন্তুষ্ট একারণে যে, আমি একটি গতানুগতিক ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আমি ইংরেজীর ছাত্র। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করি। এই ব্যতিক্রমটি ঘটেছিল একটি মাত্র কারণে। আমার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'পরিচয়' পত্রিকায় ছেপেছিলেন, আমি তখন ছাত্র। 'পরিচয়' তৎকালীন বাংলা ভাষার একমাত্র মর্যাদাবান মননশীল পত্রিকা ছিল। এই পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়ার স্বীকৃতিতে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হবার অধিকার পেয়েছিলাম। বাংলা বিভাগের সূত্রপাত হয় অর্ধেক বাংলা এবং অর্ধেক সংস্কৃত পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে। আমি যখন বাংলা বিভাগে এলাম তখন এ অবস্থার আংশিক পরিবর্তন ঘটেছে। সংস্কৃত নেই, কিন্তু তার বদলে এসেছে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান এবং হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্য। এই ধর্মীয় সাহিত্য ছিল চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল, বৈষ্ণব পদাবলী, চণ্ডীমঙ্গল এবং অন্নদামঙ্গল। আমার উপর পড়ানোর দায়িত্ব পড়েছিল 'চৈতন্য ভাগবত', 'বৈষ্ণব পদাবলী' এবং 'চণ্ডীমঙ্গল'। এগুলো আগে আমি কখনও পড়িনি। কিন্তু সমগ্র বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমি আমার উপযুক্ততা প্রমাণ করেছিলাম। ক্রমশঃ আমি

www.pathagar.com

সিলেবাস পরিবর্তনের কথা চিন্তা করতে লাগলাম এবং ইংরেজী সাহিত্যের সিলেবাসের ধাঁচে বাংলা পাঠক্রমের সিলেবাস গড়ে তোলা যায় কিনা তার চেষ্টা নিলাম। বিস্ময়কর হলেও এটা সত্য যে, প্রাচীনপন্থী বলে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও মরহুম ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আমার প্রস্তাব পূর্ণভাবে সমর্থন করেছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সিলেবাসটি ছিল পুরোপুরি হিন্দু চৈতন্যের এবং সেখানে কাব্য বা সাহিত্য বিচারটি মুখ্য ছিল না। 'চৈতন্য ভাগবত' পাঠক্রমের অন্তর্ভূক্ত করার কোন যৌক্তিকতা ছিল না। কাব্য হিসেবে এটি অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর। অবশ্য বৈষ্ণব রসতত্ত্ব এবং চৈতন্যের জীবনকাল নিয়ে লেখা এ গ্রন্থটির মূল্যবান দিক। আমাকে 'চৈতন্য ভাগবত' পড়াতে হয়েছিল সুতরাং এ কাব্যের রহস্য আমি জানি। অল্প দিনের মধ্যে সিলেবাসের পরিবর্তনের কথা আমি ভাবতে লাগলাম এবং আমার প্রস্তাবে ১৯৫০ সালের দিকে বাংলা সিলেবাসের আমূল পরিবর্তন করা হয়। বছরটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না, তবে এ ব্যাপারটা আমি স্থির নিশ্চিত যে, ১৯৫১ সালের মধ্যে এ পরিবর্তনটি সাধিত হয়েছিল। আমি অনার্সের জন্য নতুন দুটি পত্র যোগ করেছিলাম। একটি হচ্ছে ঃ 'সাহিত্য-সমালোচনা', আরেকটি হচ্ছে 'ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদ'। এ দুটি পত্রের ইংরেজী নাম হচ্ছে 'লিটারেরী ক্রিটিসিজ্‌ম' এবং 'ক্লাসিকস্ ইন ট্রাণশ্লেষণ'। মধ্যযুগের সাহিত্যপত্রেও পরিবর্তন আনা হয় এবং মুসলমান রচিত রোমান্টিক কাব্য পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। আলাওল পাঠ্য তালিকাভূক্ত হয় এবং আলাওল এর কাব্য পড়ানোর দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম। এ পরিবর্তনগুলো তৎকালীন বিচারে ছিল বিপ্লবাত্মক। সৌভাগ্যের বিষয় পরিবর্তনটি টিকে রইল। গ্রন্থের রদবদল হলেও এরপরে সিলেবাসের মৌলিক আর কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।

আমি ১৯৫৪ সালে বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেই। সেখানে আমার লক্ষ্য ছিল বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানে মর্যাদার আসনে বসানো। বিভাগীয় কর্মতৎপরতা ছাড়াও আমি সিন্ধু মুসলিম কলেজ এবং ইসলামিয়া কলেজে বাংলা বিভাগ খুলবার ব্যবস্থা করি এবং উক্ত কলেজ দুটিতে আমার দু'জন ছাত্র মোহাম্মদ ফারুক এবং মুজিবর রহমান খাঁকে নিযুক্তি দেই। নিযুক্তি দেবার কর্তা আমি ছিলাম না, কিন্তু উক্ত কলেজ দুটির অধ্যক্ষদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে এদের নিযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। করাচীতে রেডিও পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখান থেকে বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থাও করি। অল্প কিছুদিনের মধ্যে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের অস্তিত্ব পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা জানতে শিখল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্রমশঃ করাচীতে বাংলার অস্তিত্ব

www.pathagar.com

অনুভূত হতে লাগল। বাংলা বিভাগের ছাত্রদের একটি সমিতি গঠিত হল এবং প্রথম কয়েক বছর আমি তার সভাপতি ছিলাম। মুজিবুর রহমান খাঁ একটি সাংস্কৃতিক দল গড়ে তুলল। ফ্রেয়ার হলে এবং কাত্রাক হলে সে কিছু অনুষ্ঠান করল। বাংলা বিভাগে আমি নিয়মিতভাবে ষান্মাসিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম, যে সব অনুষ্ঠানে তিমিরবরণ এবং দেবু ভট্টাচার্য অংশ নিতেন। একটি উচ্ছলতা এবং প্রাণপ্রবাহে আমরা করাচীর সাংস্কৃতিক জীবনকে উজ্জীবিত করেছিলাম। ইংরেজীতে 'বেঙ্গলী লিটারারী রিভিউ' নামে একটি দ্বি-বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করি। পাঁচ বছর পর্যন্ত এ পত্রিকাটি চালু ছিল। আমি করাচী ছেড়ে আসার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। জীবনের সর্ব সময়ে আমি কর্মের দায়ভাগের মধ্যে থাকতে চেয়েছি আমার উপকারের জন্য নয়, কিন্তু আমার আনন্দের জন্য। এই সূত্রে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধান প্রধান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে ছিলেনঃ এ. কে. ব্রোহী, ডঃ মাহমুদ হোসেইন, জি. আল্লানা, হাসান আলী এ. রহমান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে—তিনি প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দী। শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ কলকাতায়, কিন্তু তখন তাঁকে চোখে দেখেছি মাত্র, কথা হয়নি। করাচীতে অবস্থানকালে তাঁর সঙ্গে একটি বিশেষ ধরনের আন্তরিকতা গড়ে ওঠে। তিনি স্পেনে রাষ্ট্রদূত ছিলেন, কিন্তু অবসর গ্রহণের পর করাচীতে যখন স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন তখন তাঁর নিঃসঙ্গ সময়ে আমিই তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিলাম। অতুলনীয় প্রজ্ঞা, সূক্ষ্ম রসবোধ, চিন্তার ব্যাপকতা এবং শিল্প-চৈতন্যের আধার শাহেদ সোহরাওয়ার্দী আমার জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। আমি তাঁর নিকটে বসে আধুনিক চিত্রকলা এবং স্থাপত্যের ব্যাখ্যা শুনেছি, চিত্রকর্মের বর্ণবিভা সম্পর্কে জেনেছি এবং জীবন ও শিল্পের মধ্যে সম্পর্ক কি তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি। যৌবনকালে তাঁর বন্ধু ছিলেন দিলীপকুমার রায়। দিলীপকুমার রায় তাঁর 'মনের পরশ' উপন্যাসের একটি চরিত্রে শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর স্বভাবকে রূপ দিয়েছেন। যাই হোক, শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শ আমার জন্য একটি বিরাট বরাভয় ছিল। প্রতি সপ্তাহে অন্তত দু'তিনবার আমরা একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হতাম এবং শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতাম। আলোচনা করতাম কথাটা ঠিক নয়। তিনিই বলতেন, আর আমি শুনতাম। তিনি বলতেন, 'দেখ, মানুষকে সর্বসময় কল্যাণ ও আনন্দকে পাবার জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। মানুষকে জানতে হবে জীবনে কল্যাণ কি, আনন্দই বা কি। শিল্পীরা তাদের স্থাপত্যকর্মে অথবা চিত্রকর্মে কল্যাণ এবং আনন্দকে প্রকাশ্য করেন।

www.pathagar.com

মানুষের অন্তরের ইচ্ছে রঙে-রেখায় এবং আকৃতিতে তারা পরিদৃশ্যমান করেন। প্রতিদিনের জীবন যাপনের মধ্যে অন্তরের ইচ্ছার প্রকাশ কিন্তু নেই, কিন্তু শিল্পের মধ্যে আছে। মার্ক শাগালের চিত্রকর্মগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ—মানুষের অন্তরের ইচ্ছেকে তিনি কি অপূর্বভাবে প্রকাশ করেছেন! প্রেমিক-প্রেমিকা ভারশূন্য হয়ে আইফেল টাওয়ারের শিরোদেশে একে অন্যকে চুম্বন করছে—এই চিত্রটি আমাকে চিরকাল মুগ্ধ করেছে। বাস্তবে তো মানুষ ভারশূন্য হতে পারে না। কিন্তু সে প্রত্যহ মুক্ত হতে চায় — প্রেমের মধ্যে এবং অনাবিল পবিত্রতার মধ্যে। শাগালের চিত্রের এই পরিচ্ছন্নতা এবং উন্মুক্ততার উচ্ছ্বাস জীবনকে আনন্দিত করে এবং মধুর রহস্যে আপ্লুত করে। এই রহস্যের সন্ধান তোমাকেও করতে হবে।'

করাচী থেকে আমি যখন চলে আসি তখন শাহেদ সোহরাওয়ার্দী আমাকে এক চীনা রেস্তোরাঁয় আপ্যায়ন করেছিলেন। এই রেস্তোরাঁর মালিক ছিলেন ক্যান্টনের অধিবাসী। রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরে শাহেদ সোহরাওয়ার্দী যখন ক্যান্টনে এসেছিলেন তখন এই রেস্তোরাঁর মালিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। আমার জন্য দেয়া এই নৈশভোজে উপস্থিত ছিলেনঃ ডঃ মাহমুদ হোসেইন, বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ, বেগম জেবুন্নেসা হামিদুল্লাহ, গোলাম আলী আল্লানা, প্রফেসর আহমদ আলী, রাজেকুল খায়েরী, শাহেদ আহমদ দেহলভী এবং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ আলী আশরাফ। বিদায় নেয়ার সময় শাহেদ সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন, 'তোমার অনুপস্থিতিতে আমি বড্ড একাকী হয়ে পড়ব। জীবনে আমার সময়ও বেশি নেই, শুধু ইচ্ছে হয় কাউকে অস্বস্তিতে না ফেলে আমি যদি হঠাৎ শেষ হয়ে যেতাম তাহলে বোধহয় ভাল হত।' কিন্তু তাঁর এই ইচ্ছে পূরণ হয়নি। দীর্ঘকাল তিনি রোগাক্রান্ত ছিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুও তাকে সহ্য করতে হয়েছিল।

বাংলা একাডেমীতে আমি এসেছিলাম ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরে। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমীতে ছ' বছর কার্যকাল পূর্ণ করে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেই। আমি যখন বাংলা একাডেমীতে যোগ দেই তখন একাডেমীতে কিছু কিছু কাজের সূত্রপাত হয়েছে মাত্র কিন্তু ব্যাপক আকারে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়নি। অনুবাদের ক্ষেত্রে, গবেষণার ক্ষেত্রে, লোকসাহিত্য সন্ধানের ক্ষেত্রে এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর একটি নতুন তৎপরতা গড়ে তুলতে আমি সক্ষম হয়েছিলাম। এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর একটি স্বীকৃতি ঘটে। আমি কোন দলের বা বিশেষ কোন রাজনৈতিক চিন্তার মানুষকে তাদের দলগত কারণে বা বিশ্বাসের জন্য প্রশ্রয় দেইনি। একাডেমীর সার্বিক গবেষণা কর্মে এবং

www.pathagar.com

অনুসন্ধান কর্মে যাঁরা উপযুক্ত ছিলেন তাদেরকেই আমি একাডেমীতে সুযোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের অহংপ্রবণতা বড় বেশি। প্রত্যেকেই ভাবেন তিনি এবং তার দলের লোককে প্রশ্রয় দেয়া একাডেমীর কর্তব্য। এর ফলে কোন একটি গোষ্ঠীবদ্ধ প্রাচীনপন্থীদের কাছে আমি অবিশ্বাসের মানুষ হয়ে পড়েছিলাম। একাডেমীর কর্ম পরিষদে এদের সংখ্যা ছিল বেশি এবং এরা একাডেমীর বিভিন্ন বিভাগের কর্মে হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন। আমি হস্তক্ষেপ বন্ধ করে দিলাম এবং তাদের নানা ধরনের উদ্ভট পরিকল্পনা বাতিল করে দিলাম। একাডেমীর কর্ম পরিচালনার সূত্রপাতে জেনারেল আজম খাঁকে গভর্নর হিসেবে পেয়েছিলাম। তাঁর সহায়তায় এবং আন্তরিক সমর্থনে আমার কর্মপথে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়নি। কিন্তু মোনায়েম খাঁ গভর্নর হওয়ার পর আমাকে বিপদগ্রস্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। যে দলটি একাডেমীর বিভিন্ন কাজে হস্তক্ষেপ করতে চাইত তারা একাডেমীর নতুন কাউন্সিল নির্বাচনে পরাজিত হয়। এর ফলে আমার প্রতি তাদের ক্ষোভ বেড়ে যায়। এরা মোনায়েম খাঁর কাছে আমার বিরুদ্ধে বিচিত্র ধরনের অভিযোগ করতে থাকে। আমি নাকি হিন্দু-প্রেমিক এবং ভারত-প্রেমিক, আমি নাকি ইসলামের ক্ষতিসাধন করছি এবং সর্বোপরি আমি নাকি পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলছি। এই ধরনের অনেক হাস্যকর অভিযোগ ছিল। মোনায়েম খাঁ কোন প্রমাণ ছাড়াই এ সমস্ত অভিযোগ বিশ্বাস করেছিলেন। আমাকে অপদস্থ করবার এবং চাকুরীচ্যুত করবার বহু প্রক্রিয়া মোনায়েম খাঁ করেছিলেন। আমার বিরুদ্ধে তিনি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। এই তদন্ত কমিটি আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। এতে ব্যর্থ হয়ে মোনায়েম খাঁ প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। আইয়ুব খান পাকিস্তানের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হককে দিয়ে এক সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। আনোয়ারুল হক সাহেব পুরো একটা দিন বাংলা একাডেমীতে অতিবাহিত করলেন। একাডেমীর বিভিন্ন কার্যক্রম পুংখানুপুংখরূপে পর্যবেক্ষণ করে যাবার সময় আমাকে বলেন, 'আপনার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কিছু মিথ্যা অভিযোগ প্রেসিডেন্টের কাছে করা হয়েছে। যে ক্ষেত্রে আপনাকে প্রশংসা করা উচিত ছিল সে ক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধে এমন সব কাণ্ডজ্ঞানশূন্য অভিযোগ করা হয়েছে যা লজ্জাজনক। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি প্রেসিডেন্টের কাছে আপনার সুস্থ এবং প্রাণবন্ত কার্যধারার রিপোর্ট দেব।' তাই তিনি দিয়েছিলেন, কিন্তু বাংলা একাডেমীতে আর আমার থাকা হয়নি। আমি বাংলা একাডেমী ছেড়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। তবে চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ মোনায়েম খাঁ'র জন্যই অবশ্য হয়েছিল। তিনি যখন দেখলেন আমাকে চাকরিচ্যুত করা যাচ্ছে না এবং শাস্তিও দেয়া যাচ্ছে না তখন তিনি আমাকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। এতে অবশ্য আমার শাপে বর হয়েছিল।

বাংলা একাডেমীতে অবস্থানের শেষ বছরটি আমার জন্য খুব যন্ত্রণার ছিল। বারবার তদন্ত, অনবরত মিথ্যা অভিযোগ, আমার বিরুদ্ধে ইসলাম বিরোধী তৎপরতার অভিযোগ—এ সমস্ত কিছু আমাকে মাঝে মাঝে খুব বিচলিত করেছে। সে সময় আমার স্ত্রী সর্বদাই আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন। আমার স্ত্রী অত্যন্ত ধর্মবিশ্বাসী মহিলা ছিলেন। তিনি বলতেন যে, যেহেতু আমার কোন অপরাধ নেই, সুতরাং পৃথিবীর কোন শক্তিই আমার অমর্যাদা করতে পারবে না। আমি চিরকাল তাই দেখেছি যে বিধাতা চিরকাল সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। জীবনের জয়যাত্রা একমাত্র সত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব। বিচার নেই, বিবেচনা নেই, কর্মের সফলতার জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ নেই এই রকম একটি অবিশ্বাস্য সংকটের মধ্যে আমি পড়েছিলাম।

১৯৭১ সালে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হই। বিশ্ববিদ্যালয়টি তখন অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং স্বল্প পরিসরের। আমি তখন চেষ্টা করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যথোপযুক্ত পূর্ণতা দেয়ার জন্য। আমি অনেক প্রবীণ শিক্ষককে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়ে আসি। প্রধানত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বেশিরভাগ শিক্ষক আসেন। এর প্রধান কারণ ছিল, যাঁরা রাজশাহীতে ছিলেন তাঁরা এক ধরনের সাংস্কৃতিক বন্ধন দশার মধ্যে ছিলেন। ঢাকায় যে সুযোগ এবং উন্মুক্ততা ছিল, ঢাকার বাইরে কোন শহরে তা ছিল না, বিশেষ করে রাজশাহীতে তো ছিলই না। যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ডঃ সালাহউদ্দিন আহমেদ, ডঃ সালেহ আহমদ, ডঃ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম প্রমুখ। তাছাড়া আরও অনেককেই নিয়েছিলাম নানা ক্ষেত্র থেকে। তার মধ্যে একজন ছিলেন ভূগোল বিভাগের প্রফেসর এম. আই. চৌধুরী এবং গণিতের ডঃ দেলওয়ার হোসেন। বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলবার কাজে এঁরা সকলেই সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু যাঁর ঋণ আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনও ভুলব না, তিনি হচ্ছেন ডঃ সালাহউদ্দিন। নতুন স্বাধীন দেশে ছাত্রদের বিচিত্র ধরনের অধিকারের দাবীর মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে যখন বিশৃংখলা সৃষ্টির উপক্রম হত তখন সালাহউদ্দিন আমার পাশে এসে দাঁড়াতেন। তাঁর সহানুভূতি এবং বিবেচনা-বোধের কথা আমি চিরকাল মনে রাখব।

www.pathagar.com

জীবনের সর্বক্ষেত্রেই কর্মের দায়ভাগকে আমি গ্রহণ করেছিলাম ঐকান্তিকভাবে। রসূলে খোদার একটি হাদীস আছে যেখানে তিনি বলেছেন, তুমি যদি জান যে তোমার মৃত্যু সন্নিকট তখন সেই মুহূর্তেও সময়ের সদ্ব্যবহার কর এবং সময় থাকলে একটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর। আমি চিরকাল এই হাদীসটি মান্য করে চলবার চেষ্টা করেছি।

www.pathagar.com

সাক্ষাতকার ঃ
সাম্প্রতিক

প্রশ্নঃ আপনি বর্তমানে অবসর গ্রহণ করেছেন। এই অবসর কালটি আপনার কি করে কাটে এবং অবসর সময়ে আপনার কি ধরনের ব্যস্ততা থাকে তা জানতে চাই!

উত্তরঃ একজন সাহিত্যিকের জীবনে অবসর বলে কোন বস্তু নেই। অবসর যেটুকু আছে তা হল সাহিত্যকর্মের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রামের অবসর। আমি বর্তমানে কোন পেশায় নিযুক্ত নই, সুতরাং পেশাগত কর্মের দায়ভাগ থেকে আমি মুক্ত। তাই বলে অবসরপ্রাপ্ত পেন্‌শনভোগী নাগরিকও আমি নই। আমার জন্য আমার জীবনে অনবরত ক্ষেত্র পরিবর্তন ঘটেছে। তাই আমার চাকরির কোন কনটিনিউটি বা ধারাবাহিকতা নেই। পেনশন পাবার সুযোগ হয়নি, প্রফিডেন্ট ফাণ্ডও জমা করতে পারিনি। কিন্তু আমার সাহিত্যকর্মের একটা ধারাবাহিকতা আছে এবং সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে আমি এখনও সচল এবং বলিষ্ঠ। প্রতিদিনই নিয়ম মত আমার সাহিত্যকর্মে নিযুক্ত থাকি। এভাবে বলতে পারি যে, আমার কোন প্রকার নির্লিপ্ত কর্মহীন সানন্দ বিশ্রাম নেই। সকালবেলা আমি এগারটা পর্যন্ত কাজ করি আবার বিকেলেও ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত কাজ করি। বিকেলবেলার কাজটি সপ্তাহে তিন দিন হয়। আর সকালবেলার কাজটি শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহের প্রতিদিন। যতদিন সুস্থ থাকব ততদিন এই ব্যবস্থাই থাকবে।

প্রশ্নঃ আপনি বর্তমানে কি কি কাজে হাত দিয়েছেন এবং কাজগুলোর গুরুত্ব কি?

উত্তরঃ আমি ধারাবাহিকভাবে দুটি লেখা লিখছি—একটি পাক্ষিক পত্রিকার জন্য। লেখাটির নাম 'শিল্পের স্বভাব ও আনন্দ'। লেখাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত শিল্পের ইতিহাস আমি পর্যালোচনা করছি। এই পর্যালোচনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন যুগে শিল্পের বিশিষ্টতা উদঘাটন করা এবং সে সব যুগে শিল্পের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা। দ্বিতীয় লেখাটি একটি দৈনিক পত্রিকার জন্য। রোজনামচার ওপর নির্ভর করে এই লেখাটি আমি তৈরি করছি 'পুরনো রোজনামচার

www.pathagar.com

পাতা' নামে। এখানে বিচিত্র বিষয় স্থান পাচ্ছে — সাহিত্য, শিল্পকলা, গ্রন্থ পরিচয়, ব্যক্তিগত জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে সমীক্ষা। এই দুটি ধারাবাহিক লেখা ছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা আমি শেষ করেছি। বাংলাদেশে মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোন ইতিহাস গ্রন্থ নেই। আমাদের ছাত্রদের নির্ভর করতে হয় কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইতিহাস গ্রন্থের ওপর। কলকাতার বইতে মুক্তচিন্তার অভাব। তাঁরা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে দেখছেন। এমন কি সুকুমার সেনের দৃষ্টিভঙ্গীও এক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন নয়। আমার ইতিহাসটি প্রকাশিত হলে একটি বিরাট অভাব দূর হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্নঃ আপনি আর কোন পূর্ণাঙ্গ রচনায় হাত দেবেন বলে ভাবছেন কি?

উত্তরঃ অনেক দিন ধরে আমার ইচ্ছা রসূলে খোদার একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করা। এজন্য অনেক দিন ধরে আমি প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি সংগ্রহ করছি। আশা করি এবার হাত দিতে পারব। একজন প্রকাশকও এব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমি কাবাগৃহে হাত রেখে এ গ্রন্থ রচনার সংকল্প ব্যক্ত করেছিলাম। সুতরাং আল্লাহতায়ালা নিশ্চয়ই এ গ্রন্থ রচনার জন্য আমাকে সাহস ও প্রেরণা দেবেন।

প্রশ্নঃ আপনার বক্তব্য থেকে একটি জিজ্ঞাসা জাগে যে, মানুষ কি নিজের চেষ্টায় কিছু করতে পারে না?

উত্তরঃ মানুষের বোধ গ্রহণ করবার ক্ষমতা এবং উপলব্ধিগত চৈতন্য, বিধাতার প্রদত্ত। মানুষ সংকল্প গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু বিধাতার সাহায্য না পেলে কিছুই করতে পারে না। মানুষ নিজের যত্নে সাফল্য বা সম্মান লাভ করতে পারে না যদি না সেখানে বিধাতার ভূমিকা থাকে। আমার জীবনে আমার সবকিছুই ঘটেছে আল্লাহর কৃপায় বা ইচ্ছায়। আমি আমার জীবনে অনেক সুযোগ গ্রহণ করিনি। পরে আমি দেখেছি সেসব সুযোগ গ্রহণ করলে আমি বিপদগ্রস্থ হতাম। এই যে আমি অনবরত ক্ষেত্র পরিবর্তন করেছি তার পিছনেও বিধাতার অভিপ্রায় ছিল। আমি আমার বাবার কাছ থেকে শিখেছিলাম আল্লাহর কাছে স্পষ্টভাবে কোন কিছু না চেয়ে বরঞ্চ একথা বলা ভাল যে আমার যাতে কল্যাণ হয় আল্লাহ যেন তাই করেন। যখনই আমি সংকটে পড়ি তখনই আমি এই প্রার্থনা করি। আমার স্ত্রী এব্যাপারে আমাকে খুব সহায়তা করতেন। তিনি কোনদিনই আমাকে চিন্তিত এবং সন্ত্রস্থ হতে দেননি।

প্রশ্নঃ আপনি একজন সৃষ্টিধর্মী লেখক। কবিতাই আপনার জীবনের প্রধান আনন্দ। কিন্তু দীর্ঘকাল আপনি কবিতা লেখেননি। এর কারণ কি?

উত্তরঃ আমার শেষ কাব্যগ্রন্থ 'সমুদ্রেই যাব'। আরও দুটি কাব্যগ্রন্থের উপকরণ আমার হাতে আছে, শিগগিরই ছাপতে দেব। নতুন কোন কবিতা

www.pathagar.com

লিখছি না এখন ঠিক। আমার কবিতার চরণবিন্যাস এবং শব্দ ব্যবহারের কৌশলের একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে যা একান্তভাবে আমার। কবিতা লিখতে বসলেই এ ভঙ্গিটি আমাকে আক্রমণ করে এবং আমি তা অতিক্রম করতে পারি না। কবিতা লিখতে বসে নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে কোন লাভ নেই। আমি লক্ষ্য করছি যে, আমাদের দেশের অনেক প্রবীণ কবি এই পুনরাবৃত্তিকে এড়াতে পারছেন না। কবিতা না লিখলেও বিবিধ প্রকার গদ্যের মধ্য দিয়ে আমি নিজেকে প্রকাশ করে চলেছি। আমার সৌভাগ্য যে সাহিত্য ও জীবনের কাছে আমি হারিয়ে যাইনি।

প্রশ্নঃ কবিতার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কোন বিশিষ্টতা গড়ে উঠেছে কিনা এ সম্পর্কে কি আপনি কিছু বলবেন?

উত্তরঃ কবিতা একটি শিল্প। প্রেরণা, সাধনা এবং অনুশীলন ছাড়া কেউ কবি হতে পারে না। কবিতায় রাজনীতি থাকতে পারে, কিন্তু কবিতা রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হতে পারে না। বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং অর্থনৈতিক চেতনা থেকে কবিতা তৈরি হতে পারে; যেমন বিষ্ণু দে-র কবিতা অথবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা। কিন্তু সমসাময়িক রাজনৈতিক কোলাহল, সন্ত্রাস এবং দস্যুবৃত্তিকে অবলম্বন করে কবিতা লেখা যায় না।

প্রশ্নঃ আপনি নিজের সম্পর্কে এখন কি ভাবছেন?

উত্তরঃ এখন আমার সবচেয়ে বড় ভাবনার বিষয় হচ্ছে আমার জীবনে যতটুকু সময় আছে সে সময়ের যথাযথ ব্যবহার। আমি এখন চেষ্টা করছি আমার সময়টাকে তাৎপর্যবহ করতে এবং সাহিত্যকর্মে নিজেকে সর্বাংশে নিয়োজিত করতে। আমি একটি ট্রাস্ট গঠন করেছি। ট্রাস্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ আমার সকল সাহিত্যকর্মকে জনসাধারণের কাছে সর্বমুহূর্তে প্রকাশিত রাখা। আমার অপ্রকাশিত অনেক পাণ্ডুলিপি আছে সেগুলো প্রকাশ করা, তরুণ গবেষকদের গবেষণার সুযোগ করে দেয়া এবং মহিলা কথাশিল্পীদের জন্য নিয়মিতভাবে বার্ষিক একটি পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা রাখা। ১৯৮৩ সাল থেকে এ পুরস্কারটি চলে আসছে।

প্রশ্নঃ আপনি এক সময় অসম্ভব রকমভাবে মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে ছিলেন, সে সময়কার অভিজ্ঞতাকে এখন কিভাবে দেখেন?

উত্তরঃ আমি অধ্যাপক ছিলাম, পরিচালক ছিলাম, উপাচার্য ছিলাম, শিক্ষামন্ত্রী ছিলাম, মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলাম। এ সমস্ত কর্মে নিয়োজিত থাকার সময় দেশ ও জাতির জন্য আমি কিছু না কিছু করবার চেষ্টা করেছি। তাতে সর্বক্ষণের জন্যই আমার একটি পরিচিতি লোকের সামনে ছিল। বর্তমানে আমি কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেছি সুতরাং

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবেই আমি এখন কর্মচঞ্চল নই। তাছাড়া বয়সও তো হচ্ছে। এই বয়সে শারীরিকভাবেই কোন বিশেষ কর্মের দায়ভাগ গ্রহণ করা অসম্ভব।

প্রশ্নঃ বর্তমানে আপনি কি করছেন?

উত্তরঃ আমি আগেই বলেছি যে, আমি কয়েকটি সাহিত্যকর্মে এবং গবেষণাকর্মে নিযুক্ত রয়েছি। তাছাড়া আমি আমার সময়গুলো কিভাবে কাটাচ্ছি প্রশ্নের তাৎপর্য যদি তাই হয়, তাহলে বলব যে আমি নিজেকে সজীব এবং সচল রাখবার চেষ্টা করছি। আমার সঙ্গে দেখা করতে লোকেরা আসে, তাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলি। একাকী যখন হই তখন জীবন সম্পর্কে চিন্তা করি এবং আমার ধর্মের আদর্শকে অনুভব করবার চেষ্টা করি। আমি বিশ্বাস করি যে, মানুষ তার প্রজ্ঞার দ্বারা, অনুভূতির দ্বারা এবং বিশ্লেষণের দ্বারা তার মুহূর্তগুলোকে কার্যকর রাখতে পারে। আমি আরও বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হচ্ছে জীবনে সে যেন হারিয়ে না যায় তার চেষ্টা করা।

প্রশ্নঃ আপনার পরবর্তী সাহিত্যকর্মী সম্পর্কে আপনি এ পর্যন্ত বিস্তারিত কিছু বলেননি। এদের সম্পর্কে কোন আশাবাদ ব্যক্ত করতে পারেননি।

উত্তরঃ আমি আমার পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িকদের কথা বিস্তারিতভাবে বলেছি। দুটি গ্রন্থে এই আলোচনাগুলো পাওয়া যাবে। একটি হচ্ছে 'আধুনিক বাংলা কবিতাঃ শব্দের অনুষঙ্গে', অন্য গ্রন্থটি 'সতত স্বাগত'। আমি আমার পরবর্তীকালের কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যেমন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আল মাহমুদ এবং শামসুর রাহমান। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে এদেরও পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকদের কথা আলোচিত হয়েছে। সুতরাং বর্তমানকালে কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বলিনি এটা ঠিক নয়। এদের সম্পর্কে একটু বিস্তারিত লেখার প্রয়োজন আছে। 'আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ শব্দের অনুষঙ্গ' গ্রন্থের নতুন একটি সংস্করণ প্রকাশ করব বলে চিন্তা করছি; সেখানে বর্তমান সময়ের কয়েকজন কবি নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছে আছে। এঁরা হচ্ছেন—রফিক আজাদ, আবিদ আজাদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, নির্মলেন্দু গুণ—এঁদের ছাড়াও আরও কয়েকজনের কথা আমি আলোচনা করতে পারি। এখনও আমার পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হয়নি।

আমাদের দেশের কবিরা অনেকেই আপনাপন কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তাদের সকলেরই ব্যতিক্রমী স্বভাব লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের বর্তমান সময়কালের দুর্যোগ, হতাশা এবং ক্ষোভ আমাদের কবিরা তাদের কবিতার শব্দে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। একটি স্বদেশ সত্তার ইচ্ছার প্রেক্ষাপটে এঁরা তাদের কলানৈপুণ্য প্রদর্শন করছেন। আমি এদের ব্যাপারে খুবই আশাবাদী।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ আপনি নিজে একজন কবি এবং একজন অত্যন্ত উঁচুমানের গদ্যশিল্পী। আপনি কবিতা ও গদ্য লেখার মধ্যে কোন পার্থক্য অনুভব করেন নি?

উত্তরঃ এই দুটি ক্ষেত্রে মানুষের মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন রকম। কিন্তু একটি অন্যটিকে অধিগ্রহণ করে। আমি যখন গদ্য লিখি তখন আমি অত্যন্ত সুশৃংখল, অত্যন্ত যুক্তিবাদী এবং বক্তব্য সম্পর্কে সুনিশ্চয়। কবিতা লেখা আমার কাছে আবেগের স্ফূরণের মত। সেখানে গদ্যের মত যুক্তিবাদী হতে হয় না। সেখানে আমি অনেক স্বাধীন। আমার কাছে কবিতা হচ্ছে শব্দের স্তবকের মত। শব্দগুলো একে অন্যের সঙ্গে পারস্পরিক সৌজন্যে ভিড় জমায়। গদ্যেই যেখানে আমাকে সমস্যার সমাধান করতে হয়, কবিতায় মনে হয় আমি সেরকম কোন সমস্যার সমাধান করি না। আমি হয়তো কবিতায় সমস্যাকে উন্মোচন করি। বর্তমানে আমি এতবেশি সচেতন যে গদ্য রচনা স্বাভাবিক আমার অবলম্বন হয়ে পড়েছে। এখন আমি কবিতা নিয়ে আর কোন পরীক্ষা-নিরিক্ষা করছি না।

প্রশ্নঃ লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী কি অন্য মানুষদের চেয়ে ভিন্ন। অর্থাৎ লেখকদের দৃষ্টি কি একটি অদ্বিতীয় অনুপম দৃষ্টি?

উত্তরঃ এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া বেশ কঠিন। এক এক ভাষার এক এক রকম স্বভাব। আরবীতে ঘোড়ার অনেক প্রতিশব্দ আছে। নানা রঙের, নানা ভঙ্গির এবং নানা রকম দৌড়ের কৌশলসহ ঘোড়ার নানা রকম নাম আছে। এস্কিমোরা বরফ বোঝাতে ৫২টি শব্দ ব্যবহার করে। ফিনিশিয়োরা তাদের লেখার মধ্যে নারী-পুরুষের ভেদ করে না। অর্থাৎ একই শব্দ অথবা বিশেষণ অথবা সম্বোধন নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এসব ভাষার সাহিত্য আমরা পূর্ণ সচেতনতার সঙ্গে গ্রহণ করতে সক্ষম হব না। কেননা তাদের দৃষ্টি এবং আমাদের দৃষ্টি আলাদা। তেমনি আবার কোন একটি ভাষার কবি তার ভাষার অতীত, মধ্যযুগ এবং বর্তমান কাল সম্পর্কে সচেতন কিন্তু পাঠক হয়ত সেই অর্থে সচেতন নয়। সুতরাং পাঠকের কাছে সেই লেখা হয়ত পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা পায় না। এ কারণে লেখক সর্বদাই পাঠকের চাইতে অগ্রগামী। আমি আমার কবিতায় 'চর্যাপদ' থেকে শব্দ নিয়েছি, মধ্যযুগের হিন্দী ও বাংলা কাব্য থেকে উপকরণ গ্রহণ করেছি, মধুসূদনের পূর্ণ চরণ অথবা অর্ধ চরণ আমার কোন কোন কবিতায় এসে গেছে। এছাড়া বিদেশী কবিদের প্রভাব তো আছে। আমার পাঠকরা এসব কিছু হঠাৎ করে উদঘাটন করতে সক্ষম হবেন না। এভাবেই আমার দৃষ্টির সঙ্গে পাঠকের দৃষ্টির একটি তফাৎ থাকবেই। সব মানুষই লেখে, চিঠি

www.pathagar.com

লেখে, স্কুল-কলেজের প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখে কিন্তু সবাই তো সাহিত্য লেখা অবলম্বন করে না। এটা বোধহয় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্য। ছেলেবেলা থেকেই সব ছেলেমেয়েরাই কিছু না কিছু লেখে, ছবি আঁকে এবং গান করে, কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশের জীবন থেকে এই প্রক্রিয়াগুলো বাদ হয়ে যায়। কেন বাদ হয়? অনেকের ক্ষেত্রে শিক্ষার অগ্রযাত্রা ব্যাহত হওয়ার কারণে বাদ যায়, আবার অনেকের ক্ষেত্রে ভাল হবে না এই বোধ থেকে অনেকে শিল্পকর্মের অনুশীলন থেকে বাদ পড়ে। এর দ্বারা এটাই প্রমাণ করা যায় যাঁরা লেখক হন অথবা যারা চিত্রশিল্পী বা সঙ্গীতশিল্পী হন তারা তাদের অনুশীলন, জ্ঞান ও বোধের ক্ষেত্রে অন্যান্য মানুষের চেয়ে অগ্রগামী।

প্রশ্নঃ ভাষার কোন কি সীমাবদ্ধতা আছে, লেখক কি কখনও তার ভাষার সীমাবদ্ধতার জন্য অসুবিধাবোধ করেন?

উত্তরঃ গুরুত্বপূর্ণ এবং চিন্তাশীল লেখকরা সব সময়ই ভাষার সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হন। প্রমাণস্বরূপ আমরা জেমস জয়েস এবং উইলিয়াম ফকনারের কথা বলতে পারি। এঁরা তাদের বক্তব্য প্রকাশের জন্য ভাষা ব্যবহারের নতুন পরীক্ষা উদ্ভাবন করেছিলেন। বাংলাতে এ রকম একজন করেছিলেন—তিনি কমলকুমার মজুমদার।

প্রশ্নঃ একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি। আপনার জীবনে কোরআন শরীফের প্রভাব কতটুকু?

উত্তরঃ আমি বিশ্বাস করি যে, একজন মুসলমানকে তার ধর্ম সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এ সচেতনতার জন্য কোরআন শরীফের পাঠগ্রহণ অপরিহার্য। আমার নিজের জীবনে আমি সকল ধর্ম বিষয়ে অনুসন্ধান করেছি। ইসলামের বাইরে যে ধর্ম বিষয়ে বেশি চিন্তা ভাবনা করেছি তা হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। আমার বিভিন্ন গদ্য রচনার মধ্যে এবং কবিতাতেও এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমি শৈশবে আরবী এবং ফারসী পরিমণ্ডলে বড় হয়ে উঠেছিলাম। আমার বাবা আরবী এবং ফারসী উভয় ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। আমার মা ফারসী এবং উর্দু জানতেন। এভাবে আমার শৈশব কেটেছিল আরবী এবং ফারসীর সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্যে। সর্বশেষ কথা হচ্ছে, কোরআন শরীফ হচ্ছে আমার জীবনের পথনির্দেশক এবং আমার সাহিত্যকর্মের প্রেরণা।

প্রশ্নঃ সর্বশেষ প্রশ্ন—আপনার জীবনে আপনার স্ত্রীর কি ভূমিকা ছিল?

উত্তরঃ জীবনকালে খুব বেশি অনুভব করিনি, কিন্তু তার মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ মুহূর্তে অনুভব করি যে, তিনি আমার জীবনের সর্বস্ব ছিলেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণঃ অধ্যাপিকা রাবেয়া মঈন

www.pathagar.com

শিক্ষা প্রসঙ্গ

প্রশ্নঃ বর্তমানে এদেশের ছাত্রসমাজের এক ব্যাপক অংশের মধ্যে তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশা ও অনিশ্চয়তার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে, এর কারণ কি?

উত্তরঃ বর্তমানে শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সকল উন্নয়নশীল দেশেই ছাত্রসমাজের মধ্যে হতাশা এবং অনিশ্চয়তা লক্ষ্য করা যায়। এই হতাশা এবং অনিশ্চয়তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও প্রকার চরম সিদ্ধান্ত স্থির নিশ্চয় না হওয়া। কোনও ব্যক্তি সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও প্রকার ইঙ্গিত করতে পারছে না, তার কারণ, সর্বত্রই আমরা লক্ষ্য করি বিভিন্ন প্রকার বিরোধী চিন্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনশীলতা। এক সময় সমাজ একটি নিশ্চিত ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করেছে। বর্তমানে সেই চিন্তার মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে দেখা যায়। অন্য পক্ষে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে নতুন নতুন চিন্তার উদ্ভব ঘটছে, যার ফলে ভবিষ্যতের একটি সুনিশ্চিত রেখাচিত্র কেউ আঁকতে পারছেন না। সংক্ষেপে বলা যায় যে, বর্তমান কালটি মানব চিন্তার একটি সংঘর্ষের মুহূর্ত। এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই একটি স্থির সম্ভাবনা ক্রমন্বয়ে রূপ ধারণ করবে। বর্তমান মুহূর্তে তরুণ সমাজ অসম্ভবরকম অস্থির এবং সর্বক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তনকামী। তারা এই পরিবর্তনটি অসম্ভব দ্রুততায় সংঘটিত হোক তাই চায়। কিন্তু পরিবর্তনের একটি সোপান শ্রেণী আছে এবং একটি ধারাক্রম আছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে যখন পরিবর্তন আসেনা তখন তারা বিক্ষুব্ধ হয়। এই বিক্ষোভ বর্তমান কালের যুগ-লক্ষণ। আমার মনে হয় এই বিক্ষোভের মধ্য দিয়েই ভবিষ্যতের একটি সম্ভাবনা নির্মিত হবে এবং হতাশা ও অনিশ্চয়তার অপনদন ঘটবে।

প্রশ্নঃ ছাত্রদের মধ্যে সম্প্রতি পরীক্ষায় দুর্নীতি ও অসুদোপায় অবলম্বনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরনের প্রবণতার কারণ কি?

উত্তরঃ আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণগত ব্যবস্থার মধ্যে প্রচুর ত্রুটি আছে। যার ফলে পরীক্ষায় দুর্নীতি ত্যাগ করা তাদের অনেকের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। একটি ছাত্রের যথার্থ মূল্য নিরূপণের জন্য যে

www.pathagar.com

প্রকৃতির মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা দরকার, সেই মূল্যায়নের ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই। যার ফলে বার্ষিক পরীক্ষাটি একটি অর্থহীন কৌশলে পরিণত হয়েছে মাত্র। বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশে পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। নিয়মিত প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের গ্রহণ ক্ষমতা, বিশ্লেষণ প্রবৃত্তি এবং ধারণের ক্ষমতা নির্ণয়ের ব্যবস্থা তারা করে থাকেন। এর ফলে প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে একটি ছাত্রের মূল্য নির্ধারণও করা হয়। আমাদের দেশের চিরাচরিত প্রথার মতো এক বছর বা কয়েক বছর শেষে সামগ্রিকভাবে মূল্য নিরূপণের ব্যবস্থা পৃথিবীর কোনও দেশে নেই। ইংরেজীতে যাকে বলে 'সেমিষ্টার সিস্টেম', অর্থাৎ পাঠ কালকে কয়েকটি সময়ে বিভক্ত করে সেই সময়ের মধ্যে গঠিত বস্তুর ক্ষেত্রে ছাত্রের অধীত জ্ঞানের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এভাবে আমরা দেখি যে, এই ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষা দুটি ভিন্ন বস্তু নয়। এরা একে অন্যের সঙ্গে জড়িত সময়ের দিক থেকে, এবং জ্ঞানের গ্রহণ এবং বিশ্লেষণের দিক থেকে। যে পর্যন্ত না বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার সংশোধন আমরা করতো পারবো সে পর্যন্ত পরীক্ষায় দুর্নীতি রোধ করা যাবে না।

প্রশ্নঃ ছাত্রদের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া কি আপনি সমর্থন করেন? আপনি কি মনে করেন রাজনীতির জন্য ছাত্ররা তাদের মূল কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হন?

উত্তরঃ কালের রাজনৈতিক চৈতন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমান যুগে কেউ বাস করতে পারে না এবং ছাত্রাবস্থায় শিক্ষাগত সম্পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা রাজনীতি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠেন। এই সচেতনতা দেশ এবং জাতির জন্য সর্বমুহূর্তেই প্রয়োজন। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রদের সক্ষম সহায়তা আমরা গ্রহণ করেছি। বর্তমানে দেশ নির্মাণের কাজে তাদের স্বকীয় অংশগ্রহণ আমরা কামনা করি। সুতরাং দেশের রাজনৈতিক চৈতন্য থেকে তারা দূরে থাকুন এটা আমি কোনও দিনই আশা করবো না। বরঞ্চ আমি চাইবো যে, তারা তাদের চিত্তকে উন্মুক্ত রেখে সকল প্রকার চিন্তার সম্মুখীন হবেন এবং শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক চিন্তায় দানা বাঁধতে থাকবে এবং অবশেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যখন বেরিয়ে আসবেন তখন তারা সজাগ নাগরিক হিসেবে জীবন ক্ষেত্রে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। কিন্তু সকল কিছুর অতিরিক্ততা যেমন জীবনের জন্য ক্ষতিকর তেমনি রাজনৈতিক চিন্তার অতিরিক্ততাও জীবনের জন্য দুর্বিষহ। ছাত্রাবস্থায় ছাত্রদের কর্তব্য হচ্ছে যথার্থ নাগরিক হওয়ার জন্য, পূর্ণকাম নাগরিক হওয়ার জন্য রাজনীতি

www.pathagar.com

সম্পর্কে সচেতন থেকে আপন আপন প্রশিক্ষণের কর্তব্যকে অবহেলা না করা।

প্রশ্নঃ আপনি কি মনে করেন আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি দেশ ও জাতির চাহিদা পূরণে সক্ষম? সক্ষম না হলে এ সম্পর্কে আপনার পরামর্শ কি?

উত্তরঃ শিক্ষার সঙ্গে মানব সম্পদ ব্যবহারের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। দেশের ভবিষ্যৎ শিল্প উন্নয়ন কখন কি পরিমাণে হবে, প্রকৌশল ক্ষেত্রে কত সংখ্যক লোকের প্রয়োজন, কৃষিক্ষেত্রে কত সংখ্যক লোকের প্রয়োজন, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কত সংখ্যক লোকের প্রয়োজন এবং সচল শিক্ষা ব্যবস্থায় কত সংখ্যক লোকের প্রয়োজন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজন জরিপ না করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাধারণভাবে চালু রাখার কোনও অর্থ হয় না। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে মানব সম্পদ ব্যবহারেরও জরিপের প্রয়োজন, যাকে বলা হয় 'ম্যান পাওয়ার সার্ভে'। আমাদের দেশে এই জরিপ এ পর্যন্ত হয়নি, বর্তমানেও এ ধরনের জরিপ নিয়েও কেউ চিন্তা করছেন বলে মনে হয় না। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজসমূহের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। কোন ছাত্র কোন ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত সে বিচার না করে দেশ ও জাতির প্রয়োজনে যে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন সে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে একটি চূড়ান্ত নৈরাজ্য চলছে। আমরা যদি জানতাম যে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এবং পাঁচ বছর পর বৎসরান্তে কত জন প্রকৌশলী আমাদের দরকার, কতজন কৃষি বিজ্ঞানী প্রয়োজন, কতজন ডাক্তার প্রয়োজন, বিভিন্ন শিক্ষার স্তরে কতজন শিক্ষক প্রয়োজন, ইত্যাদি। তাহলে আমরা সেই অনুপাতে বিভিন্ন শিক্ষা ধারায় ছাত্র ভর্তি করতে পারতাম। যে পর্যন্ত না এই জরিপ আমরা করতে পারছি সে পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূর করা সম্ভবপর হবে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক থাকা দরকার। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় একই সঙ্গে যদি গ্রথিত থাকে তাহলে সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। বর্তমানে এগুলো বিচ্ছিন্ন প্রকোষ্ঠের মতো। এক প্রকোষ্ঠের প্রশাসন, আবহাওয়া এবং শিক্ষার মান অন্য প্রকোষ্ঠের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কিত নয়। যার ফলে একজন সাধারণ ছাত্র বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করে আসছে সত্য কিন্তু সকল প্রকোষ্ঠের শিক্ষার সমন্বয়ে একজন পূর্ণকাম বয়প্রাপ্ত নাগরিক হতে পারছে না। বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন। আশা করি এই শিক্ষা কমিশন এ সমস্ত সমস্যাগুলো পরীক্ষা করে দেখছেন এবং দেখবেন।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রদত্ত ডিগ্রী কর্মক্ষেত্রে যথার্থভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে কোনও ব্যক্তির অর্জিত ডিগ্রী ও তার কাজের চরিত্রের মধ্যে কোনও সাযুজ্য নেই, এর কারণ কি?

উত্তরঃ এ প্রশ্নটি উপরের প্রশ্ন থেকে উদ্ধৃত এবং উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। ডিগ্রী ব্যক্তির প্রয়োজনে লাগে, দেশের প্রয়োজনে লাগে না, তখন ডিগ্রীর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রের কোনও সামঞ্জস্য থাকে না। যে ব্যক্তি সারা জীবন তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ করে আসছে সে যখন আবার এম. এ. ডিগ্রী লাভের জন্য চেষ্টা করে এবং সেখানেও কোনও ক্রমে তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ করে বেরিয়ে আসে তখন তার এই উচ্চ ডিগ্রীর মূল্য দেশ ও জাতির কাছে আছে কি? এই মূল্যহীন ডিগ্রী সে শুধু গ্রহণ করেছে কোনও ক্রমে চাকরির ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি করা যায় কিনা সেই চেষ্টায়। একেই আমি বলছি যে, ডিগ্রী ব্যক্তি বিশেষের চাকরির উপকরণ হয়েছে কিন্তু দেশের প্রয়োজনে অভিজ্ঞ নাগরিক নির্মাণের ক্ষেত্রে তার কোনও মূল্য হচ্ছে না।

প্রশ্নঃ বর্তমানে প্রায় সর্বত্রই গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে। গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তরঃ গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং দেশের প্রতিটি কর্মক্ষম নাগরিককে তার মেধা এবং কুশলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাকে দেশের কাজের উপযোগী করে তোলা। এজন্য প্রয়োজন দেশের মানব শক্তির জরিপ, যে কথা উপরের প্রশ্নের উত্তরে পূর্বেই বলা হয়েছে।

প্রশ্নঃ অনেকেই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সীমিত করা এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়া বন্ধ করার কথা বলছেন। আপনি কি মনে করেন এই বক্তব্য গণমুখী শিক্ষা প্রচলনের প্রতিকূল?

উত্তরঃ শিক্ষা যেখানে দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত সেখানে শিক্ষা সীমিতকরণের প্রশ্ন উঠে না, প্রশ্ন উঠে শিক্ষাকে কর্মধারার সঙ্গে সম্পর্কিত করে তার প্রবাহকে অব্যাহত রাখা। আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা নামে যা প্রচলিত তা হচ্ছে কর্ম এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, অনবরত ডিগ্রী বৃদ্ধি। আমাদের বিবেচনা করতে হবে যে, দেশের প্রয়োজনে আমরা কোন ক্ষেত্রে কত সংখ্যক লোকের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা রাখবো। প্রতি বছর বহু লোক উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যাচ্ছেন। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা লাভ করে ফিরে এসে ব্যক্তিগতভাবে তাদের লাভ হচ্ছে, জাতিগতভাবে দেশের বিশেষ কোনও লাভ হচ্ছে না। আমাদের এখন প্রয়োজন উচ্চতর প্রশিক্ষণ

www.pathagar.com

এবং গবেষণার সুযোগ দেশের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা, যাতে অনবরত বিদেশী মুদ্রা খরচ করে এই বিদেশী শিক্ষার প্রহসনকে রোধ করা যায়। যারা বিদেশ থেকে শিক্ষা পেয়ে এসেছেন তাঁদের দ্বারা দেশের অভ্যন্তরে নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণার সুযোগ প্রবর্তন করতে হবে।

www.pathagar.com

সাক্ষাতকার ঃ দৈনিক বাংলা

প্রশ্নঃ কিভাবে লেখালেখিতে এলেন?

উত্তরঃ আমাদের পরিবারে শিক্ষা এবং সাহিত্যের একটি ধারাক্রম দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান ছিল। আমার দাদা এবং আমার নানা উভয়েই ইসলামী সাহিত্য সাধনায় দক্ষ পণ্ডিত ছিলেন। আমার নানা আমার দাদারই ছোট ভাই ছিলেন। আমার বাবা আরবীতে এম. এ পর্যন্ত পড়েছিলেন। পরীক্ষা দেননি। এদিকে আমার মা ফার্সী এবং উর্দুতে কুশলতা অর্জন করেছিলেন। এর ফলে আমার জন্মের পর থেকে আমি একটি সুন্দর আরবী উচ্চারণের পরিমণ্ডলের মধ্যে ক্রমশ বড় হয়ে উঠি। শৈশবে আরবী আমাকে শিখতে হয়েছে। ফার্সী এবং উর্দুও শিখেছি। সেই সঙ্গে ইংরেজীর চর্চাও ছিল। সুতরাং একথা ঠিক ভাষা জানার সুযোগ শৈশবেই আমার ঘটেছিল। সেই সঙ্গে ফার্সী কবিতা শোনা ও পাঠের সুযোগও হয়েছিল। ঢাকায় আরমানীটোলা সরকারী বিদ্যালয়ে যখন চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হই তখন আমার বয়স ৯ বছর। বাবা ভর্তির সময় আমাকে বাংলার বিকল্প হিসেবে উর্দু পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বাবাকে না জানিয়ে অল্প কিছুদিন পর আমি উর্দুর পরিবর্তে বাংলা নেই। এর পেছনে একটি কারণ ছিল। উর্দু ক্লাসে সঙ্গী পেয়েছিলাম মাত্র একজনকে। সে আবার বিরাট বড়লোকের ছেলে। তার সঙ্গ আমার ভাল লাগতো না। কিন্তু বাংলা ক্লাসে অনেকেই ছিল। তাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। আমি এসব বন্ধুদের কথায় বাংলা ক্লাসে চলে আসি। আরমানীটোলা স্কুলে প্রাণবল্লভ বসাক নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি আমার বাড়ি যশোর শুনে মন্তব্য করেছিলেন যে যশোর হচ্ছে মধুসূদনের দেশ। সুতরাং তোমাকে বাংলাতে পণ্ডিত হতেই হবে। এভাবেই বলতে পারি বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমার আকর্ষণ নির্মিত হতে থাকে। স্কুলে একটু উপরের ক্লাসে উঠে কবিতা লিখতাম। মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রের গদ্যভঙ্গি অনুসরণ করে কিছু গদ্য লিখবারও চেষ্টা করতাম।

সুতরাং বলা যেতে পারে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যধারার মধ্যে বিলসিত হলাম। এই সংযোগ আমৃত্যু থাকবে।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে কবিতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন কেন?

উত্তরঃ আমি যখন নবম শ্রেণীতে পড়ি তখন আমার ছোট বোনের গৃহশিক্ষক ছিলেন কবি মতিউল ইসলাম। মতিউল ইসলাম ছিলেন ঢাকা জেলখানার কাছে অবস্থিত অম্বিকাচরণ এম. ই. স্কুলের ইংরেজী শিক্ষক। আমার বাবা স্কুল পরিদর্শক ছিলেন। তিনি মতিউল ইসলামকে আবিষ্কার করেন এবং আমাদের বাসায় নিয়ে আসেন। ঢাকা শহরে তখন 'চাবুক' নামে একটি সাপ্তাহিক অথবা পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। মতিউল ইসলাম সেই পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা লিখতেন। আমি সে সময় একটি ইংরেজী কবিতা লিখেছিলাম 'দি রোজ' নামে। কবিতাটি বেরিয়েছিল আরমানীটোলা স্কুলের বার্ষিকীতে। কবিতাটি এমন কিছু নয়। কিন্তু মতিউল ইসলাম এর বাংলা অনুবাদ করে আমার নামে চাবুক পত্রিকায় ছাপিয়ে দেন। এভাবে আমি কবি হিসেবে চিহ্নিত হলাম। কবিতাটির প্রথম দু'লাইন এখনও মনে আছে ঃ 'বাগানে ফুটিয়াছিল গোলাপের ফুল/তুলে নিয়ে বলিলাম অতি সুকুমার।' এর পরের লাইনগুলো মনে নেই। কবিতা হিসেবে মোটেও উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু মতিউল ইসলাম আমার জন্য নতুন একটি আবেগের দ্বার উন্মোচন করেছিলেন। সেই যে কবে কবিতার মধ্যে নিমগ্ন হয়েছিলাম আজও সেই নিমগ্নতার মধ্যেই বাস করছি।

প্রশ্নঃ লেখকের সামাজিক অঙ্গীকার কি?

উত্তরঃ একজন লেখক একটি সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বাস করেন। তাঁর একটি পারিবারিক পরিমণ্ডলও আছে। এই সামাজিক ও পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে লৌকিক আবহ থাকে, ধর্মীয় আবহও থাকে। প্রতিদিনকার জীবনযাপন এবং মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একজন মানুষের জীবনযাত্রা। একজন লেখক এই পরিমণ্ডলের বাইরে কখনও যেতে পারে না। তাঁকে উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে সমাজ থেকে, জীবন থেকে এবং ক্রমান্বয়ে ইতিহাস থেকে এবং কল্পনা থেকেও।

সাহিত্য অবশ্যই শিল্প। কিন্তু সে শিল্প জীবনরহিত শিল্প নয়। জীবনকে গ্রহণ করে এ শিল্পের স্ফূর্তি এবং জীবনকে স্পর্শ করেই এ শিল্পের অভিব্যক্তি। যে লেখক যতো গভীরভাবে জীবনকে জানবেন, সে লেখকই ততো গভীরভাবে জীবনকে প্রকাশ করতে পারবেন। আমি লেখকের অঙ্গীকার বলতে এটা বুঝি যে, তিনি তার পরিচিত জীবন ও সত্যের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। সত্য হচ্ছে একটি গভীর উপলব্ধি। যা বিশ্বাসের আয়তনের মধ্যে রূপ লাভ করে। কোন সাময়িক ঘটনা অথবা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সাহিত্যের স্থায়ী উপকরণ হয় না। কিন্তু জীবনের প্রতি বিশ্বাস এবং

www.pathagar.com

গভীরভাবে জীবনের সঙ্গে মমতাবন্ধন হলেই একজন সাহিত্যিক সত্যকে প্রকাশ করতে সক্ষম হন। এই সঙ্গে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে সত্য সর্বদাই মানুষকে সান্ত্বনা দেয় এবং বরাভয় দেয়। যে সাহিত্যিক সত্যকে গ্রহণ করেন না, তিনি বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেন। তিনি যথার্থ সাহিত্যিক নন। আমাদের দেশে মানুষকে আক্রমণ করা এবং বিশ্বাসকে অবহেলা করা একটি রীতিপ্রকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা এই রীতি ও প্রকরণের উদ্‌গাতা তারা সত্যকে অস্বীকার করে থাকেন। তাদের সাহিত্য যথার্থ সাহিত্য নয়। লেখক হিসেবে আমার অঙ্গীকার হচ্ছে সত্যের কাছে, বিশ্বাসের কাছে। সমাজের মধ্য থেকেই এবং পরিবারের মধ্য থেকেই এই সত্য ও বিশ্বাসকে আমি জেনেছি। আমি মনে করি বিপুলা কাল এবং নিরবধি পৃথ্বীতে একমাত্র সত্য ও বিশ্বাসই জয়ী হবে।

প্রশ্নঃ আপনি ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র কিন্তু বাংলা গবেষণায় দেখিয়েছেন পারঙ্গমতা। কিভাবে এটা সম্ভব করেছেন?

উত্তরঃ আমি ইংরেজীর ছাত্র এটা ঠিক। রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেনও ইংরেজীর ছাত্র ছিলেন। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ও ইংরেজীর ছাত্র ছিলেন। মোহিতলালও ছিলেন ইংরেজীর ছাত্র। প্রমথ চৌধুরীও ইংরেজীর ছাত্র ছিলেন। এভাবে বাংলা সাহিত্যচর্চায় অগ্রণীর ভূমিকা যারা পালন করেছেন তাদের অনেকেই ইংরেজীর ছাত্র ছিলেন। ইংরেজীর ছাত্র থাকার ফলে এদের মধ্যে সাহিত্যবোধও জাগ্রত হয়েছিলো এবং সমালোচনার দক্ষতা এঁরা অর্জন করেছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রধান সাহিত্যধারা। বাংলা সাহিত্য ইংরেজীর সংস্পর্শে এসেই নিজেকে বিকশিত করতে সক্ষম হয়েছে। এখনও বাংলা সাহিত্য ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব-বলয়ের মধ্যে বাস করে। ইংরেজী সাহিত্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যোগসূত্র থাকাতে এদের পক্ষে বাংলায় মূল্যবান সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব। ব্যতিক্রম অবশ্য থাকবে। সে আলাদা কথা।

আমি এ ধারারই সর্বশেষ প্রতিনিধি। ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র হয়েও আমি বাংলার অধ্যাপক হয়েছিলাম। আমার পরে আর কেউ হয়নি। আমার পূর্বে অবশ্য অনেকেই হয়েছে। আমি মনে করি যে ইংরেজীর সঙ্গে সংস্পর্শ থাকার ফলে বাংলা সাহিত্যকর্মে ব্রতী হতে অনেক সুবিধাজনক অবস্থান পেয়েছিলাম।

প্রশ্নঃ আপনার কবিতার কেন্দ্রীয় অন্বেষণ কি?

উত্তরঃ আমি জীবনকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছি সততা ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। এই সততা ও বিশ্বাস জীবনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, প্রেম ও অহমিকার সঙ্গে জড়িত, আনন্দ ও বেদনার সঙ্গে জড়িত।

www.pathagar.com

এক সময় আমি প্রেমের তাৎপর্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলাম্। সে তাৎপর্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে শক্তি সাধন পদ্ধতি এবং বৈষ্ণব সাধন পদ্ধতি আমি পরীক্ষা করেছি। এসব কারণে আমার কবিতার মধ্যে দেহের কথা এসেছে। কিন্তু অবশেষে হৃদয়ের কথাটি প্রাধান্য পেয়েছে। বলেছি যে, হৃদয়কে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আবার হৃদয়কে স্পর্শ ছাড়া দেহের কোন মূল্য থাকে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হৃদয় অর্ঘ্যটি জীবনের সব থেকে মূল্যবান, একথা আমি বলেছি। এখানেই আত্মার কথা এসেছে। বিশ্বাসের কথা এসেছে। একটি বিশ্বাসী পরিবারের মধ্যে আমার জন্ম, যারা সুফী সাধনায় নিজেদের সিদ্ধি কামনা করেছে। আমি এই বিশ্বাসের তাৎপর্য অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করেছি। জানতে চেয়েছি কোথায় এ বিশ্বাসের স্থিতি। ভাবতে চেয়েছি এ বিশ্বাস আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে এবং আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছি আমার ত্রাণ কোথায়। কেউ কেউ তাই হয়তো ভেবেছেন আমার কবিতায় মানুষের কথা নেই। কিন্তু শুধু একটি অবয়ব নিয়েই তো মানুষ নয়। অথবা পার্থিব জীবনের কর্মকাণ্ড নিয়েই মানুষ নয়। মানুষের একটি পরিচয় এবং যেটিকে আমি প্রধান পরিচয় বলে মনে করি, সে হচ্ছে তার অন্তরাত্মার পরিচয় এবং চৈতন্যের পরিচয়। এই পবিচয়ের মধ্য দিয়েও মানুষের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা যায়। এই উদ্‌ঘাটন করার মধ্য দিয়েই আমি জীবনের সঙ্গে যুক্ত এবং জীবনবিমুখ নই। আমার কবিতার কেন্দ্রবিন্দুতে একটি অতলস্পর্শী বিশ্বাস আছে, যে বিশ্বাস মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে এবং তার আত্মার চৈতন্য সম্পর্কে।

প্রশ্নঃ আমাদের কবিতার বর্তমান অবস্থাকে কিভাবে দেখছেন?

উত্তরঃ প্রত্যেক কবিতার দুটো দিক আছে—একটি হচ্ছে কবির দিক আর একটি হচ্ছে পাঠকের দিক। কবির দিক থেকে আন্তরিকতা আছে কিনা এটা দেখবার প্রয়োজন আছে, পাঠকের দিক থেকে পাঠকের গ্রহণ—ক্ষমতা আছে কিনা, এটাও বিবেচনা করবার দিক আছে। পাঠক একটি সময়ের শাসনে বাস করে। সুতরাং তাকে সময়ের রাজনীতি, সময়ের কর্মকাণ্ড এবং সময়ের তুচ্ছতার মধ্যে বাস করতে হয়। কিন্তু এ সবকিছুর উর্ধ্বে মানবসত্তার একটি অবিনশ্বর রূপ আছে, সেই রূপটাকেই কবি আবিষ্কার করবার চেষ্টা করবেন বলে আমি ভাবি। আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে কবিতায় সময়ের, সাময়িক অবস্থাকে অস্বীকার করতে পারছে না। যার ফলে কবিতা জীবনের গভীরকে তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছে না। তাই দেখি অশ্লীল ক্রোধ প্রকাশ, বিবেচনাহীন আক্রমণ এবং অক্ষম চিৎকার কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছে। মনে রাখতে হবে, কবিতা যদি জীবনের যথার্থ চৈতন্যকে

www.pathagar.com

প্রকাশ করতেই সক্ষম না হয়, তাহলে সে কবিতা কবিতা হয় কি করে? আমি আমার দিক থেকে অন্তত পক্ষে চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে মানববোধের অঙ্গীকার কবিতার মধ্যে প্রকাশিত হয়। সৌভাগ্যের কথা এই যে, দুর্বল ও ক্ষীণবাহু যদি ক্ষুব্ধ ও অসহিষ্ণু হয় তাহলে তারা বিকারেরই সৃষ্টি করে, আনন্দের জন্ম দেয় না। আমাদের দেশের কিছু কিছু কবি এই বিকারের জন্মদাতা হিসেবে বর্তমান সময়ে চিহ্নিত হয়ে পড়ছেন। এদের অবস্থা সকল চিকিৎসার বাইরে।

আমি এখনও বিশ্বাস করি, কবিতার জন্য পরিবেশ আমাদের দেশে এখনও আছে। আমরাও ঐতিহ্যকে আবিষ্কার করতে পারি। বিশ্বাসকে আবিষ্কার করতে পারি, এবং জীবনকে সততার মধ্যে পতিষ্ঠিত করতে পারি। আমাদের কবিতা কেন্দ্র কাব্য ক্ষেত্রে এই সততা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়েছে।

প্রশ্নঃ আজকের তরুণদের কবিতা পড়েন? কেমন লাগে?

উত্তরঃ আমি তরুণদের কবিতাও পড়ি। এবং তাদের বিষয়ে আমি আশাবাদী। তবে কবিতা যেহেতু শিল্প, সুতরাং কবিতা লিখতে হলে শিল্প-সচেতনতা থাকা প্রয়োজন। জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হবে, কবিতায় শব্দ ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং বাংলা কাব্যের সামগ্রিক ইতিহাস জানতে হবে। এভাবে জানার পরিধি যদি একজনের বিস্তৃত হয়, তাহলে শিল্প-সচেতনতার নিমগ্নতায় নিবিষ্ট হয়ে শিল্প সৃষ্টি কেন করতে পারবে না তা আমি বুঝি না।

প্রশ্নঃ আপনার বিখ্যাত কবিতা 'আমার পূর্ববাঙলা'র পটভূমি কি ছিল?

উত্তরঃ 'আমার পূর্ববাঙলা' লেখার পূর্বে আমি বিদেশে ঘুরেছি অনেকবার। বিশেষ করে ফ্রান্স ও জার্মানীতে। ওসব জায়গা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর স্থায়ীভাবে ঢাকায় এসে বসলাম ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরে এবং ১৯৬১ এবং ৬২ সালে বাংলা একাডেমীর পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ অঞ্চলের অভ্যন্তরে আমি ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেছি। সদ্য প্রত্যাগত আমার কাছে মাতৃভূমির সকল দৃশ্য অপূর্ব লেগেছিল। সেই অপূর্ব স্বাদের অনুভূতিগুলোই এই কবিতায় ধরা পড়েছে।

প্রশ্নঃ বিদেশী পত্র-পত্রিকা ও বইপত্রের ঢালাও আমদানী কি আমাদের গ্রন্থ জগৎকে বিপদাপন্ন করছে?

উত্তরঃ আমরা যে পর্যন্ত না আমাদের দেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজস্ব কিছু প্রতিবেদন উপস্থিত করতে পারছি, সেই পর্যন্ত বিদেশী প্রভাবের আক্রমণ বিপদের সৃষ্টি করতে পারে। তবে এই আক্রমণ থেকে রক্ষা

www.pathagar.com

পাবার উপায় কিন্তু বিদেশী পত্র-পত্রিকা বন্ধ করা নয়। বিদেশী সংস্কৃতি ও প্রবাহকে মোকাবিলা করবার তিনটি পথ আছে, একটি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সাহায্যে এমন একটি মানসিকতার সৃষ্টি করা, যে মানসিকতার সাহায্যে আমরা আমাদের নিজস্ব সত্তাকে অনুভব ও প্রকাশ করতে সক্ষম হব। দ্বিতীয়ত, আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড জাতীয় জীবন ও বিশ্বাস যাতে উন্মোচন করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। তৃতীয়ত, বিদেশী পত্র-পত্রিকার মোকাবিলায় আমাদের নিজস্ব উন্নতমানের পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা।

প্রশ্নঃ জাতীয় সংস্কৃতি কমিশন গঠন করে আপনারা কি করতে চেয়েছিলেন? এর প্রয়োজনীয়তাই বা কেন?

উত্তরঃ ইউনেস্কোর নির্দেশে ইউনেস্কোর সদস্যভুক্ত দেশগুলোর অনেকেই তাদের সাংস্কৃতিক নীতিমালা তৈরি করেছে। মেক্সিকো, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা—এই সমস্ত দেশ ইতিমধ্যেই তাদের স্ব স্ব দেশের সাংস্কৃতিক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। আমাদের দেশও ইউনেস্কোর এই নির্দেশ মান্য করেই সংস্কৃতি কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের রিপোর্ট ক্যাবিনেট কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এই রিপোর্টের ভূমিকাটি আমার নিজের লেখা। সেখানে সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান সম্পর্কে যে কথাগুলো লিখেছিলাম তা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

এক. প্রত্যেক সংস্কৃতি জাতিসত্তার ঐতিহ্যকে প্রকাশ করে এবং কতগুলো অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রত্যেক জাতি তার সংস্কৃতির মাধ্যমে পৃথিবীতে তার উপস্থিতিকে সুচিহ্নিত করে।

দুই. সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের সুনিশ্চয়তার মাধ্যমে একটি জাতি তার স্বাধীন বোধকে প্রমাণিত করে, অপর পক্ষে বিরোধী সংস্কৃতির আগ্রাসন জাতিসত্তার অভিজ্ঞানকে ধ্বংস করে।

তিন. সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তার অতীতকে আবিষ্কার করে অতীতের প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ হয় এবং বাইরের পৃথিবীর কাছ থেকে কল্যাণপ্রদ বস্তু গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়। একটি জাতি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকেই শুভ ও কল্যাণকে গ্রহণ করে সৃষ্টিধর্মিতার মধ্যে অগ্রসর হতে পারে।

চার. পৃথিবীর সকল প্রকার সংস্কৃতিই মানবজাতির ঐতিহ্য। একটি জাতির সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান বলিষ্ঠ ও তাৎপর্যবহ হয় বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে। সংস্কৃতি এক প্রকার সংলাপের মত। সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি সমৃদ্ধমান হয়, বিনিময় না থাকলে যে কোন সংস্কৃতিই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

www.pathagar.com

পাঁচ. কোন একটি একক সংস্কৃতি তার সর্বজনীনতা স্বীকৃত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পৃথিবীর অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়তেই হবে এবং এ সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে সে তার নিজের অস্তিত্ব প্রমাণিত করবে। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

ছয়. বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না, বরঞ্চ আদান-প্রদান সহজ ও সুন্দর হয়। সংস্কৃতির বহুবচনতা, যাকে আমরা ইংরেজীতে বলি প্লুরালিজম, বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করেই তৈরী হয়ে থাকে।

সাত. মানুষের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতিকে সম্মান ও সংরক্ষণ করা।

আট. একটি জাতির সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং অভিজ্ঞান সংস্কৃতির দ্বারাই চিহ্নিত হয়। মনে রাখতে হবে সংস্কৃতির মাধ্যমে আত্মিক, মানসিক এবং পার্থিব ইচ্ছার বিকাশ ঘটে থাকে। যথার্থ উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষের কল্যাণ। মনে রাখতে হবে সকল উন্নয়নের মূলে রয়েছে মানুষ। সুতরাং কোন দেশের জন্য সাংস্কৃতিক নীতি নির্ধারণ করতে গেলে সে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে এবং জীবনযাপনের ব্যবস্থাকে সম্মান করতে হবে।

নয়. সংস্কৃতি জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয় এবং জনগোষ্ঠীর কাছেই প্রত্যাবর্তন করে। সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা অধিকার সকল শ্রেণীর মানুষেই পাবে, কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষ নয়। সুতরাং সকল মানুষ যাতে সংস্কৃতির সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে সে কারণে সকলের জন্য শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করতে হবে এবং সকলকেই সমান সুযোগের অধিকার দিতে হবে।

দশ. একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে যে সমস্ত বিষয় গণ্য হবে তা হচ্ছে শিল্পীদের শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্যিকদের সাহিত্য-সাধনা, স্থপতিদের নির্মাণকর্ম, সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীত, নৃত্যশিল্পীদের নৃত্য-ব্যঞ্জনা, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার এবং অনুসন্ধানকর্ম, মানুষের ধর্মবোধ এবং সেই সমস্ত মূল্যবোধের সুকৃতি যা জীবনকে অর্থদান করে। অধিগম্য এবং অনধিগম্য সকল কর্ম, মানুষের ভাব প্রকাশের ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি, বিশ্বাস, ঐতিহাসিক নিদর্শন, নৃতত্ত্ব, গ্রন্থাগার সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

এগার. পৃথিবীতে বহুদেশে অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে বহু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির অপরিকল্পিত

www.pathagar.com

প্রয়োগের ফলে সংস্কৃতিতে আঘাত লেগেছে। আবার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঔপনিবেশিকতা, বৈদেশিক প্রভাব সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করে। সুতরাং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি দেশ তার স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে যে নীতিমালা কমিশন চিহ্নিত করেছিল তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

এক. আমাদের আবহমান ঐতিহ্যের অনুসরণ, জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচেতনার অনুষঙ্গরূপে প্রাপ্ত নৈতিক চেতনাকে সমুন্নত রাখার প্রয়াস।

দুই. ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত বাংলাদেশের মানুষের মানবতাবোধের সঙ্গে বিশ্ববোধের ঐক্য সাধন।

তিন. আমাদের লিখিত-অলিখিত সুদীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মহান আদর্শ যাতে জাতীয় জীবনে অবিনশ্বর রূপ লাভ করে তার ব্যবস্থা গ্রহণ।

চার. জাতীয় জীবনে সহনশীলতার ভাবধারাকে জোরদার করে কার্যকর গণতান্ত্রিক বোধের বিকাশ সাধন, বিদেশী সংস্কৃতির সুকৃতি গ্রহণ ও অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।

পাঁচ. সর্ববিধ উপায়ে জাতীয় সংস্কৃতির অবক্ষয় রোধ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন।

ছয়. বাংলাদেশে বিদ্যমান সকল ধর্মাবলম্বীদের ধর্মচর্চা ও অনুষঙ্গী কার্যক্রম পরিকল্পনার ও বাস্তবায়নের অবাধ সুযোগ রয়েছে এবং থাকবে। তবে কোন বিশেষ সম্প্রদায়েরই এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে যার দ্বারা অন্য সম্প্রদায়ের মনমানসিকতা আহত হবার সম্ভাবনা থাকে। সাম্প্রদায়িকতাশূন্য বর্তমান বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সম্প্রীতি পরিপূরক কার্যক্রমের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

প্রশ্নঃ আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য কি হুমকির সম্মুখীন বলে মনে করেন?

উত্তরঃ কোন দেশের সংস্কৃতিই হুমকির সম্মুখীন হতে পারে না। কেননা, সংস্কৃতির নিজস্ব এক বিশ্বাসের ধারা আছে। সেই ধারাকে পাল্টে দেয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। সংস্কৃতি নদীর মত তার নিজস্ব ধারাতেই প্রবহমান থাকে। তবে যুগে যুগে সংস্কৃতি নতুন তথ্য সংগ্রহ করে, নতুন বিশ্লেষণ গ্রহণ করে এবং নতুন নতুন স্বভাবে কিছু প্রক্রিয়ায় আলোড়িত হয়। যেমন আমাদের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি একটি মিশ্র সংস্কৃতি। এর মধ্যে

www.pathagar.com

বৌদ্ধ প্রভাব আছে, হিন্দু প্রভাব আছে, ইসলামের প্রভাব আছে। এগুলোর মধ্যে ইসলামের প্রভাবটাই প্রধান। কিন্তু অন্য প্রভাবগুলো অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের সমাজ জীবনের মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আচরণে একটা মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

www.pathagar.com

সাক্ষাতকার ঃ মাসিক 'বই' পত্রিকা

প্রশ্নঃ আপনার বহুবিধ পরিচয় আমরা জানি। আপনি কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক, ঔপন্যাসিক ইত্যাদি। লেখালেখির একদম আদিতে কোন মাধ্যমে আপনি লেখা শুরু করেছিলেন?

উত্তরঃ শৈশবে গ্রন্থপাঠের প্রতি আকর্ষণ আমার প্রবল ছিল। কাব্যপাঠ শ্রবণের সৌভাগ্যও আমার হত। আমাদের পরিবারে শিক্ষার পরিমণ্ডল ছিল বিস্তৃত। আমার বাবা আরবী এবং ফারসী উভয় ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর আরবী পাঠ শুনে আমি মুগ্ধ হতাম, অধিকতর মুগ্ধ হতাম তাঁর কণ্ঠে ফেরদৌসীর 'শাহনামা' শুনে। এভাবে শৈশব থেকেই কাব্যের পরিমণ্ডলে আমি বড় হয়ে উঠি। একটু বড় হতেই ফারসী শিখেছিলাম। ঢাকা শহরে এসে আরমানীটোলা সরকারী বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পূর্বেই ফারসী শিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক আমি পড়ে শেষ করেছি। এক কথায় বলা যায়, কাব্যের উচ্চারিত ধ্বনির মোহমুগ্ধতার মধ্যে আমি ক্রমশঃ বড় হয়েছিলাম। ঢাকায় আরমানীটোলা স্কুলে এসে তখন সেই অল্প বয়সে স্কুলের পাঠাগার থেকে নিয়মিত বই নিয়ে পড়তাম। এভাবেই আমি জুলভার্ণ-এর বাংলায় অনূদিত কিছু গ্রন্থ পাঠ করি। তার মধ্যে কুলদারঞ্জন রায় কর্তৃক অনূদিত 'সাগরিকা' বইটি আমার উপর খুব প্রভাব বিস্তার করে। সমুদ্রের অতলে অপার্থিব সৌন্দর্যের বিবরণ পাঠ করে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আরও অনেক বই পড়েছি। গ্রন্থপাঠ এবং কবিতা শ্রবণ আমাকে ক্রমশঃ সাহিত্য নির্মাণের আকাঙ্খার দিকে নিয়ে আসে। আমি গদ্য পড়েছি খুব বেশি। সে তুলনায় কবিতার বই বেশি পড়তাম না। কিন্তু একটি আকস্মিক ঘটনায় আমি বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করলাম। আরমানীটোলা স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন একজন ইংরেজ। টি. জে. কলিন্স তাঁর নাম। আমাদেরকে ইংরেজী পড়াতেন ড্যানিয়েল হোরেশিও জোনস নামক এক ইংরেজ যুবক। স্বাস্থ্য বিষয়ে পড়াতেন মিসেস ওয়েস্ট, ইংরেজী উচ্চারণ শেখাতেন ডক্টর মাইকেল ওয়েস্ট। এদের প্রতাপে এবং প্রশ্রয়ে ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণ গড়ে ওঠে এবং ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখতে শিখি।

www.pathagar.com

আমি যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন প্রথম আরমানীটোলা স্কুল থেকে একটি ইংরেজী বার্ষিকী প্রকাশিত হয়। সেখানে আমার একটি ইংরেজী কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নাম ছিল 'দি রোজ' বা 'গোলাপ ফুল'। চৌদ্দ পঙক্তির একটি কবিতা। কবিতাটি লেখা হয়েছিল 'আযাম্বিক প্যান্টা মিটার' ছন্দে। এই ছন্দটি আমি তখন শিখেছিলাম ড্যানিয়েল জোনসের কাছে। সে সময় আমাদের বাসায় আমার এক ছোট বোনের গৃহশিক্ষক ছিলেন কবি মতিউল ইসলাম। তিনি আমার ইংরেজী কবিতাটি বাংলায় অনুবাদ করে আমার নামে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'চাবুক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। বাংলা কাব্যক্ষেত্রে এভাবেই আমার প্রবেশ। সুতরাং বলা যেতে পারে সাহিত্যক্ষেত্রে কবিতা দিয়েই আমার যাত্রা শুরু হয়।

প্রশ্নঃ অনেক মাধ্যমেই আপনি লিখছেন। কোন্ মাধ্যমে আপনি সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বা কোন্ মাধ্যম আপনাকে আনন্দ দেয়?

উত্তরঃ অনেকদিন আগে একজন ঔপন্যাসিক আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন ঔপন্যাসিকরা অনেক অনেক পাতায় শব্দ লিখেও স্বীকৃতি পান না আর কবিরা একটি পাতায় কবিতা লিখে স্বীকৃতি পান—এটা কি অবিচার নয়? আমি তাঁর উত্তরে বলেছিলাম, গদ্য আমরা সব সময় ব্যবহার করি এবং সব সময় ব্যবহার করি বলেই গদ্য ব্যবহারে একটি সহজতা ও নিশ্চিন্ততা আছে। কবিতায় শব্দ ব্যবহার অত সহজ নয়। কবিতায় শব্দকে পরিশীলিত হতে হয়, উপমা-রূপক এবং প্রতীকের ব্যবহার হতে হয়। শব্দ ব্যবহারে শৈথিল্য এলে কবিতায় সর্বনাশ ঘটবে। কবিতায় শব্দ ব্যবহারটি সেই কারণে নিশ্চিন্ত এবং স্বতঃস্ফূর্ত হয়। অনেক চিন্তা-ভাবনা এবং বিবেচনার সাহায্যে কবিতাকে গ্রহণ করতে হয়।

আমি কথা বলতে ভালবাসি। যাঁরা আমার বক্তৃতা শুনেছেন তাঁরা গদ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমার সুনিশ্চয় স্বাচ্ছন্দ্য দেখে মুগ্ধ এবং পুলকিত হয়েছেন। কথা বলতে আমার ভাল লাগে। বাংলা গদ্যে শব্দকে নিয়ে বিচিত্র খেলায় আমি আনন্দ পাই। বিগত কুড়ি বছর ধরে আমার যে সমস্ত গদ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলো সবই মুখে মুখে বলা। এভাবে মুখে মুখে বলার পদ্ধতিতে আমি খুবই স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি। অবশ্য গবেষণাধর্মী রচনার ক্ষেত্রে আমি নিজের হাতে লিখি এবং চিন্তা করে লিখি। কবিতাও আমার জন্য বিশেষ চিন্তার ফসল। কবিতা লিখতে আমার সময় লাগে। সব রকমের চিন্তাকে একটি বিশ্বাসে উন্মুখ করার মধ্যে চিন্তার প্রতিষ্ঠা থাকবেই। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, গদ্য রচনায় আমি খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। অবশ্য

www.pathagar.com

সকল মাধ্যমই আমাকে আনন্দ দেয়। বর্তমানে আমি স্মৃতিকথা লিখছি। এটাতেই আমি সবচেয়ে আনন্দ পাচ্ছি। জীবনের রেখে আসা সময়গুলো যখন স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আসে তখন আমার খুবই ভাল লাগে। একটি উৎসাহ এবং আনন্দ আমাকে আপ্লুত করে। এই আনন্দ আমি বিশ্লেষণ করতে পারব না।

প্রশ্নঃ কোন্ মাধ্যমে আপনি সবচেয়ে বেশি কাজ করেছেন বলে আপনার ধারণা এবং কোন্ মাধ্যমে আপনার স্বীকৃতি বেশি মিলেছে?

উত্তরঃ গদ্য মাধ্যমেই আমি বেশি কাজ করেছি। কবিতার তুলনায় আমার গদ্য রচনা অজস্র বলতে হবে। এ সমস্ত গদ্য রচনার মধ্যে সাহিত্যের ইতিহাস ও সমালোচনা আছে, কবিতার বিষয়বস্তু ও তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা আছে, শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা আছে, উপন্যাস আছে, প্রাচীন যুগ এবং মধ্যযুগের কাব্য নিয়ে গবেষণাধর্মী রচনা এবং নাটক আছে। এক কথায় গদ্য সাহিত্যের সকল দিককেই আমি স্পর্শ করেছি। উপন্যাসে আমি স্বীকৃতি পাইনি। নাট্যরচনাতেও আমার বিশিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠা নেই। যদিও রূপান্তরিত নাটক হিসেবে 'ইডিপাস' একটি সফল, বহুল পঠিত ও অভিনীত নাটক।

মৌলিক গবেষণা হিসেবে আমার 'পদ্মাবতী' গ্রন্থটি উভয়বঙ্গে বিপুল স্বীকৃতি পেয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ গ্রন্থটিকে 'মনুমেন্টাল' বলে অভিহিত করেছিলেন। তবে কবি হিসেবে আমার স্বীকৃতিটি স্বচ্ছন্দ এবং স্বাভাবিক স্বীকৃতির মত।

প্রশ্নঃ আপনার কবিতায় ফরাসী চিত্রকলার স্ফূরণ লক্ষ্য করা যায়। চিত্রকলার সমালোচনা করতে করতে কিংবা চিত্রকলার উপর নিরন্তর পড়াশুনার ফলে এটি হতে পারে। আপনি কি মনে করেন চিত্রকলার যে ধারা বিপ্লবের প্রয়োগ আপনার, 'আমার প্রতিদিনের শব্দ' নামক কবিতা সিরিজে করেছেন, তা সফল?

উত্তরঃ চিত্রকলার সঙ্গে আমার যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। যদিও চিত্রকর্মে অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কখনও করিনি। স্কুল জীবনে সঙ্গীত এবং চিত্রকলা প্রশিক্ষণের সুযোগ ছিল। আরমানীটোলা সরকারী ইংরেজী বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সঙ্গীত এবং চিত্রকলা অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। সে সময় গান শিখবার চেষ্টা করেছি, ছবি আঁকবারও চেষ্টা করেছি। কিন্তু এ দুটি শিল্প চর্চায় আবিষ্ট হতে পারিনি। স্কুল ছেড়ে যখন কলেজে গেলাম তখন থেকেই কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করলাম এবং শিল্প চর্চার সুযোগটা কমে গেল। কিন্তু দেশ বিভাগের পূর্বে কলকাতায় চাকরি জীবন যখন আরম্ভ করি তখন আবার সঙ্গীত এবং চিত্রকলার জগতে নতুন করে প্রবেশ

www.pathagar.com

করলাম। জয়নুল আবেদীন আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি তখন কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষক। আরও কয়েকজন মুসলমান চিত্রশিল্পীকে বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলাম কলকাতায়। যেমন আনোয়ারুল হক, শফিউদ্দিন আহমদ, লেডি রানু মুখার্জীর সঙ্গে এই সময় পরিচয় ঘটে। তিনি শিল্প-রসিক ছিলেন এবং তরুণ শিল্পীদের উৎসাহ দিতেন। শিল্পী যামিনী রায়ের এক ছেলে আমার বন্ধু ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে যামিনী রায়কে কাছে থেকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, চিত্রকলার একটি পরিমণ্ডলের মধ্যে আমি নিজেকে প্রকাশিত রাখতে পেরেছিলাম। ছবি দেখতাম, ছবির বই পড়তাম। এভাবে আমি নিজের জন্য একটি উৎফুল্ল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

১৯৫৪ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগদান করি। করাচী থাকাকালীন সময়ে প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তিনি শিল্পরসিক হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ছিলেন। তাঁর কাছে ছবির পাঠ নিয়েছি এবং চিত্রাংকন পদ্ধতিতে যেসব বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি। প্রফেসর সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন পিকাসো এবং মার্ক শাগাল। এঁদের রেখাঙ্কন এবং বর্ণ প্রলেপণ সম্পর্কে শাহেদ সোহরাওয়ার্দী অনেক কথা বলেছেন।

১৯৫৬ সালে আমি যখন প্রথম প্যারিসে যাই তখন সেখানে বিখ্যাত ফরাসী লেখক ইভানগলের পত্নী ক্লেয়ার গলের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তিনি যথার্থ পুত্রস্নেহে তাঁর সান্নিধ্যে আমাকে টেনে আনেন। তাঁর গৃহে প্যারিসের প্রধান প্রধান শিল্পীদের আগমন ঘটতো—যেমন পিকাসো, মার্ক শাগাল এবং সালভাদর দালি। রু্য ভানুতে তিনি যখন থাকতেন তখন সেখানে মার্ক শাগালকে আমি একদিন দেখেছিলাম।

বিদেশে যখনই গিয়েছি তখন আর্ট গ্যালারী দেখার জন্যে সময় করে নিয়েছি। এভাবে বলতে পারি, চিত্রকলা আমার উপলব্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমার কবিতার মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির চিত্ররূপ ধরা পড়ে—কখনও একের পর এক দৃশ্যপট উন্মোচন, কখনও সমন্বিতভাবে একই সঙ্গে অনেকগুলো দৃশ্যের উন্মোচন। শুধুমাত্র তাই নয়, চিত্রকলার মধ্যে যেমন 'কিউবিজম' পদ্ধতি আছে, 'ল্যাণ্ডস্কেপ' পদ্ধতি আছে, আবার 'পরাবাস্তববাদী' পদ্ধতি আছে, এগুলোর সবকিছুই আমার কবিতার আঙ্গিক নির্মাণে সহায়তা করেছে, 'আমার প্রতিদিনের শব্দ' কবিতাটিতে বিভিন্ন স্বভাবের চিত্ররূপ একটি মূল সত্যকে ধারণ করে আছে। মূল সত্যটা হচ্ছে

www.pathagar.com

শব্দকে গ্রহণ করে আমি প্রতিবাদকে বাঙময় করতে চাই। চিত্রকল্পের মধ্যে ঘাস আছে, দেয়ালের ফাটল আছে, ভাঙা সিঁড়ি আছে, সাপ আছে, অন্ধকার আছে, আবার রুদ্ধকক্ষের মধ্যে বিদ্যুতের বাতি আছে। এই চিত্রকল্পগুলো একে অন্যের সঙ্গে পরস্পর আশ্রিত হয়। কিন্তু আমার চেতনাকে প্রকাশ করবার জন্য এগুলোর প্রয়োজন হয়েছে। মূলতঃ অরি রুশ্যোর চিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমি এ কবিতাটি রচনা করেছিলাম। রুশ্যো তাঁর চিত্রের মধ্যে একটি সহবাস নির্মাণ করেছেন বিভিন্ন প্রাণ চৈতন্যের, যেখানে ব্যাঘ্র আছে, সাপ আছে, নগ্নিকা রমণী আছে, সবুজ গাছ লতাপাতা আছে এবং হলুদ ও লাল ফুল আছে। এগুলোর সবই চেতনার নিদর্শন বহনকারী। আমার কবিতার মধ্যে আমি আমার ভাষার, শব্দের অধিকারকে নির্মাণ করতে চেয়েছি। সেই অধিকার নির্মাণের রূপকল্পে মানুষ এসেছে, সাপ এসেছে, ভগ্ন অট্টালিকা এসেছে, দূর্বাঘাস এসেছে, আকাশের নক্ষত্র এসেছে। আবার নিরুদ্ধ গৃহের অভ্যন্তরে বিদ্যুতের আলো এসেছে। সুতরাং ফরাসী চিত্রকলার সঙ্গে আমার কবিতার মিল আছে এটা ঠিক।

প্রশ্নঃ 'আমার পূর্ববাংলা' আপনার বহুল পঠিত কবিতার একটি। এটি পাঠ্য তালিকাভূক্ত হয়েছে। কবিতাটি রচনার পটভূমি বর্ণনা করবেন কি?

উত্তরঃ আধুনিক ফরাসী কবি পিয়ের ইমানুয়েল একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'বিদেশকে ভাল করে দেখে নাও। পরে যখন দেশে ফিরবে তখন দেশকে অনেক গভীরভাবে পাবে।' পিয়ের ইমানুয়েল পরে ফরাসী একাডেমীর সদস্য হয়েছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি করাচী ছেড়ে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসি। সে সময় আমি বাংলা একাডেমীর পরিচালক পদে যোগ দেই। বাংলা একাডেমীর পরিচালক পদে যোগ দিয়ে আমার বাংলাদেশ অনুসন্ধানের সুযোগ হয়। আমি সিলেটে যাই, দিনাজপুরে যাই, চট্টগ্রাম যাই এবং এভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পটভূমি পরীক্ষা করার সুযোগ পাই। এই সুযোগের আমি পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলাম। বাংলাদেশের নদীকে আমি সে সময় দেখেছি। বৃক্ষলতা দেখেছি, প্রান্তর দেখেছি এবং প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্য দেখেছি। একটি ঘটনার কথা সুস্পষ্ট মনে পড়ে। দিনাজপুরে সে সময় একবার গিয়েছিলাম। দিনাজপুরের রাজবাড়ীর সামনে একটি গাছ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। গাছটি অপূর্ব ঘনবিন্যস্ত পাতায় ভরপুর ছিল। গাছের ছায়া দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, এই ছায়াটি অত্যন্ত শীতল এবং স্নিগ্ধ। আমি স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞেস করে

www.pathagar.com

গাছটির নাম জেনেছিলাম 'তমাল তরু'। আমার সে মুহূর্তেই মনে হয়েছিল গাছটি যেন বাংলাদেশের প্রতীক। আমি সে কথাই 'আমার পূর্ববাংলা' শীর্ষক কবিতাটিতে লিখেছিলাম 'আমার পূর্ববাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল।' তেমনি আরেক জায়গায় লিখেছিলাম যে, বৃষ্টি তো দেখেছি পৃথিবীর অনেক দেশে কিন্তু আমার দেশের বৃষ্টি অন্য রকম। সেখানে ধান ক্ষেত ভিজে যায়, ভেজা গরু দৌড়ে ঘরে যেতে চায় এবং নদীতে, ডোবায় মৃদঙ্গের সাড়া তোলে।

'আমার পূর্ববাংলা' শীর্ষক কবিতাগুচ্ছ অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আবেগপ্রবণতায় আমি রচনা করেছিলাম। কবিতাটি বহুল পঠিত এবং পাঠক সাধারণের কাছে সহজেই সমর্থিত ও স্বীকৃত হয়েছে।

প্রশ্নঃ আপনার কবিতায় আধ্যাত্মিকতা স্পষ্ট নয়। তবে একটি ধর্মীয় আবহ এবং ধর্মীয় প্রসঙ্গ আপনি ব্যবহার করেছেন। এগুলো কি আপনার ধর্ম বিশ্বাসের ফলে এসেছে, না নিছক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন?

উত্তরঃ আমার পিতা এবং মাতা উভয়ই ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং সূফীতত্ত্বে দীক্ষিত ছিলেন। সূফী সাধনার নিয়ম-কানুন তাঁরা পালন করতেন। কিন্তু আমার পিতা দীক্ষা দেবার অধিকার অর্জন করেননি। তিনি ধর্ম জীবন এবং কর্মজীবনের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তবে আমার পূর্বপুরুষ যাঁদের পরিচয় বংশ-লতিকাসূত্রে জেনেছি তাঁদের অধিকাংশই সূফী সাধক ছিলেন। তাঁরা সকলেই আরবী-ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন এবং জ্ঞান সাধনায় অংশত সংসার-বিবাগী ছিলেন। সুতরাং অধ্যাত্মবোধ উত্তরাধিকারসূত্রেই আমি পেয়েছি। এক পর্যায়ে আমি দীক্ষা গ্রহণ অর্থাৎ মুরিদও হয়েছিলাম। সেটি ১৯৫২ সালের কথা। কিছুদিন সূফী সাধনতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছিলাম, পড়াশোনাও করেছিলাম। সম্ভবত এক বছরকাল। পরে এর মধ্যে পুরোপুরি নিমগ্ন থাকিনি। নিমগ্ন না থাকলেও সূফী তত্ত্বজ্ঞদের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্খা আমার সর্বদাই ছিল, এখনও আছে। আমার কবিতার মধ্যে মরমীবাদের কিছু প্রভাব কখনও কখনও এসেছে, কিন্তু এমন প্রবলভাবে নয় যার ফলে বলা যায় যে, আমি সূফীতত্ত্বের দ্বারা আক্রান্ত। একটি কথা আমি সুস্পষ্টভাবে বলব যে, অধ্যাত্মসাধনায় অগ্রসর না হলেও একটি পরম বিশ্বাসের মধ্যে আমার জীবন পরিচালিত হয়েছে এবং সেটা হল ঃ সকল কিছুর মূলে আল্লাহর অস্তিত্ব সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান। এ জীবনে একজন মানুষ সত্যকে অবলম্বন করে যে উপলব্ধি অর্জন করে মৃত্যুর পর সেই উপলব্ধি তাকে স্রষ্টার সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়। আমার সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'সমুদ্রেই যাব'তে কিছু কবিতা আছে, যার মধ্যে এই বিশ্বাসের

www.pathagar.com

প্রতিবর্ণীকরণ ঘটেছে। আমার কবিতার ধর্মীয় অনুষঙ্গ কোন উপকরণ নয় কিন্তু বিশেষ মুহূর্তের উপলব্ধির স্মারক।

প্রশ্নঃ আপনার 'চাহার দরবেশ' থেকে 'সহসা সচকিত' পর্যন্ত সমগ্র কাব্যধারায় আপনি ভিন্ন ভিন্ন পরিমণ্ডলে পর্যটন করেছেন। এখানে প্রেম ও রমণী, স্মৃতি ও জাগৃতি, অস্তিত্ব ও আত্মচেতনা, অভিজ্ঞতা ও দর্শন পরিস্ফুটিত হয়েছে। আপনি কোন্ মণ্ডলে পৌঁছার জন্য এভাবে বারে বারে বদলে যাচ্ছেন?

উত্তরঃ একজন কবির একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে সত্যকে আবিষ্কার করা। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তিনি জীবনগত একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান। ইয়েটস চেয়েছিলেন সকল গ্লানি, শংকা এবং বিপর্যয়ের অবশেষে একটি শান্তির নিলয় নির্মাণ করতে। তিনি বাইজানটিয়ামের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এক সময় রোমান্টিক স্বপ্ন সাধন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। পরে ক্রমশঃ নানাবিধ অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করে তিনি একটি পরম শান্তির অবস্থান কামনা করেছিলেন। ইয়েটসের কবিতা আমাকে প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। তেমনি টি. এস. ইলিয়ট আধুনিক সময়ের হতাশা ও বন্ধ্যাত্বের অবশেষে এমন একটি সময় কামনা করেছেন যেখানে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ একাকার হয়েছে।

'চাহার দরবেশ' আমার পরীক্ষামূলক কাব্যগ্রন্থ এবং 'সমুদ্রেই যাব' আমার সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। এই উভয় কাব্যগ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য প্রবল। প্রথম থেকেই আমি চেষ্টা করেছিলাম আমার নিজস্ব কবিভাষা আবিষ্কার করতে। এই যাত্রা সহজ ছিল না। ইসলামী ভাবাবহকে প্রমাণ করবার জন্য শুরুতে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছিলাম প্রচুর। কিন্তু তাতে আমি তৃপ্তি পাইনি। আমি যেন ওসব ভাষা ও শব্দের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। 'অনেক আকাশ' কাব্যগ্রন্থে আমি প্রথম নিজস্ব ভঙ্গির সাক্ষাৎ পাই। বাংলা কবিতার শব্দ ভাণ্ডার থেকে এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে আমি প্রধানত শব্দ নির্বাচন করেছি। এই শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাধন পদ্ধতির ইচ্ছা এবং অনুজ্ঞার ভাষা আমি গ্রহণ করেছি। এর ফলে আমার কবিতার ভাষার এমন একটি রূপ ফুটে উঠেছে যা একান্তই আমার, কোনক্রমেই অন্য কারো নয়। সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'সমুদ্রেই যাব' কবিতাগুলোতে আমি একটি অনাবিল প্রশান্তি কামনা করেছি। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পরে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এর অনেকগুলো কবিতাই আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে লেখা। তাছাড়া পার্থিব জীবন অতিক্রান্ত মানবাত্মার অনন্ত জীবন সম্পর্কে কিছু প্রতীকী ব্যঞ্জনা অনেকগুলো কবিতায় আছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রের মধ্যে প্রেমের বিন্যাস এবং বিলোসন আছে। একটি কথা এখানে

www.pathagar.com

বলা দরকার, আমি দেহ এবং হৃদয় নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি। হৃদয়ের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক কি? হৃদয় কি দেহহীন হয়? না, হৃদয় দেহ অতিক্রান্ত একটি সত্তা? এ সমস্ত প্রশ্ন আমার অনেক কবিতায় এসেছিল। প্রথম দিক থেকেই প্রেম ও রমণী, স্মৃতি ও জাগৃতি, অস্তিত্ব ও আত্মচেতনা, অভিজ্ঞতা ও দর্শন আমার কবিতাগুলোর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে আছে। সবকিছুর শেষে আমি এমন একটি অবস্থানে পৌছবার চেষ্টা করেছি যেখানে কোন সংশয় নেই।

শেষে একটি কথা বলা প্রয়োজনঃ একজন কবিকে যথার্থ কবি হতে হলে বার বার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়। সত্যকে তো মানুষ অকস্মাৎ পায়না। নানা বিঘ্ন-বিপর্যয় ও সংশয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ তা পায়। আমার জীবনেও তাই ঘটেছে।

প্রশ্নঃ 'উচ্চারণ' আপনার পরীক্ষামূলক একটি কবিকর্ম। কবিতাকর্মে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজটি দুরূহ, সকলেই প্রায় গতানুগতিক পথে চলতে চায়। ভালো কবিতা হয়তো অনেকেই লিখছেন। কিন্তু বর্তমানে কেউ ব্যতিক্রমী কিছু করতে পারছেন না বলেই মনে হচ্ছে। এই শূন্যতা কেন বলতে পারেন? এই শূন্যতা কেন সৃষ্টি হয়?

উত্তরঃ কাব্য হিসেবে 'উচ্চারণ' ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেনি। বলা উচিত পাঠকের হাতে পৌছায়নি। প্রকাশক মাত্র একশত কপি বই বাঁধাই করেছিলেন। বাকী ফর্মাগুলো অগ্রন্থিত অবস্থায় গুদামে ছিল। সেখানে উই পোকায় ফর্মাগুলো খেয়ে ফেলে। তার ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে আমি বইটি পৌছাতে পেরেছিলাম। পরে অবশ্য 'কাব্য সমগ্র' গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছিল। এটাও এখন বাজারে নেই। গ্রন্থটি একটি পরীক্ষামূলক কাব্য প্রক্রিয়া। ফরাসী ভাষায় এ ধরনের গ্রন্থ অনেক আছে। জীবন সম্পর্কিত বিচিত্র অনুভূতি কবিরা স্বাক্ষরিত করেন অনেকটা গদ্যের আদলে। এর মধ্যে অনেকটা তীব্রতা থাকে। আমি 'উচ্চারণ' কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে আমার একান্ত অনুভূতিগুলোকে বাঙ্ময় করতে চেয়েছি। এর মধ্যে আমার পারিবারিক জীবনের কথা আছে, আমার স্ত্রীর কথা আছে এবং আমার মার কথা আছে। এগুলো ছাড়াও আমার পঠন-পাঠনের কথা, ইচ্ছার কথা, পার্থিব বিবিধ লাবণ্যের কথা এ কাব্যগ্রন্থে আছে। বাংলা ভাষায় এ প্রকৃতির গ্রন্থ আর দ্বিতীয়টি নেই।

রবীন্দ্রনাথ এক সময় নিছক গদ্যের ধারাক্রমে তাঁর কিছু চিন্তা-ভাবনা রূপান্তরিত করেছিলেন শব্দে। সেগুলো মূলত তত্ত্ববাহী ছিল। সেসব লেখায় প্রকৃতিকে অবলম্বন করে জীবনের উপলব্ধির কিছু প্রয়াস ছিল। সেগুলো সুন্দর এবং সেগুলোও কিন্তু পাশ্চাত্য কাব্যধারার। ফরাসী ভাষায় কবি

www.pathagar.com

রোজার কাইওয়ার-এর 'পাথর' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ আছে। সেখানে অনেকগুলো গদ্য বক্তব্য কাব্যমূর্তি ধারণ করেছে। কাইওয়ার বইটি একটি অসাধারণ বই। ভদ্রলোক আজীবন পাথর সংগ্রহ করেছেন। এই সংগ্রহের মধ্যে মহামূল্যবান পাথর যেমন আছে, তেমনি সমুদ্র সৈকতে কুড়িয়ে পাওয়া নুড়িও আছে। এই সংগ্রহের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর বিশ্বাস এবং সৌন্দর্যপ্রীতিকে তুলে ধরেছেন। প্যারিসে কাইওয়ার ফ্ল্যাটে এই সংগ্রহ দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। আমার 'উচ্চারণ'-এর কবিতাগুলোর কয়েকটি কবিতার ভঙ্গি কাইওয়ার রচনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ।

একজন কবিকে অনবরত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। চিরকাল একটি বিন্দুর চতুর্দিকে আবর্তিত হলে তাঁর চলে না। আইরিশ কবি ইয়েটস্ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে যে ধরনের মধুর রোমান্টিক কবিতা লিখেছিলেন বিংশ শতকের মধ্যখানে এসে তাঁর কবিতা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। তিনি অনবরত নতুন নতুন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। সত্য প্রকাশের যথার্থ ভাষা তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন। আমাদের দেশে কবিতা রচনায় এই পরীক্ষার প্রচণ্ড অভাব। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলাম যেভাবে বিচিত্র প্রকাশে আপনাপন প্রত্যয়কে স্বাক্ষরিত করেছেন এখন সে রকম চেষ্টা নেই। ত্রিশের কবিদের সময়কাল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র প্রকাশ ভঙ্গির পরীক্ষার দ্বার রুদ্ধ হয়েছে। এখন যাঁরা লেখেন তাঁদের অনেকেই যেন একই কবিতা বারবার লেখেন। একই প্রকাশভঙ্গি, একই ক্লান্ত পদক্ষেপ। যার ফলে কবিতাকে জীর্ণতার সমারোহ বলে মনে হয়। আমি 'চাহার দরবেশ' থেকে আরম্ভ করে 'সমুদ্রেই যাব' পর্যন্ত বিচিত্র পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়েছিলাম। আমি অনবরত আমার ভাষাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিলাম। আমি চিরকাল নিজেকে আধুনিক রাখবার চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বলেছিলেন 'চিরকালের রোমান্টিক'। আমি বলি যে আমি চিরকালের আধুনিক। অনেকদিন আমি কবিতা লিখিনি, নতুন প্রকাশের একটি ভঙ্গি খুঁজছি, কিন্তু এখনও পাইনি। নতুন করে আদৌ পাব কি না জানি না। কাব্যক্ষেত্রে এভাবে নতুন সৃষ্টি নির্মাণে শূন্যতার কারণগুলো গ্রন্থপাঠের প্রতি অনাগ্রহ এবং অভিজ্ঞতার অভাব। আমার কবিতায় জাপানী চিন্তা ভাবনার অংশত প্রকাশ পাচ্ছে। পাশ্চাত্য কাব্যপাঠের উপলব্ধি আছে এবং আদিমতম কাল থেকে বাংলা এবং হিন্দীকাব্যের প্রভাব আছে। আমি এখনও সর্বসময়ে পড়াশোনায় নিমগ্ন থাকি এবং যা পাঠ করি তার উল্লেখযোগ্য অংশের নির্যাস বাংলা ভাষার পাঠককে দেবার চেষ্টা করি।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ চিত্রকলা তথা চিত্রশিল্পের প্রতি কবি সাহিত্যিকদের আগ্রহ বলতে গেলে নেই। অনেকে এর দুরূহ জগতে প্রবেশ করতে চাননা। কিন্তু আপনি অত্যন্ত আগ্রহী এ বিষয়ে। তার প্রমাণ আপনার 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য' গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে অনেক বিষয়ের সঙ্গে স্থাপত্যশিল্পও স্থান পায়। আমরা জানতে চাই এসব বিষয়ে আপনার আগ্রহ কেমন করে এল? সে গ্রন্থ আপনি লিখেছেন তাতে কি আপনি তৃপ্ত?

উত্তরঃ ঢাকা আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার পিছনে আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আমি একা ছিলাম না। আমার সঙ্গে আবদুল গনি হাজারী এবং জয়নুল আবেদীন ছিলেন। পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, ইউনেস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং দেশব্যাপী একটি আন্দোলন গড়ে তোলা এসব আমাদের দায়িত্ব ছিল। শফিউদ্দিন, কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক এবং আমিনুল ইসলাম আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। বর্তমানে আর্ট স্কুলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত একটি ইনস্টিটিউটে পরিণত হয়েছে। এই ইনস্টিটিউটের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সিলেবাস আমিই তৈরি করেছিলাম।

এই আর্ট ইনস্টিটিউটে স্নাতকোত্তর ক্লাস যখন খোলা হয় তখন আমি সেখানে পড়িয়েছি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার একক চেষ্টায় এবং ডঃ মল্লিকের পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোগিতায় ফাইন আর্টস বিভাগ সেখানে খোলা হয়। ১৯৬৮–৬৯ এর দিকে আমি যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত তখন শিল্পকলার কয়েকটি ক্লাস আমি নিতাম।

এই উপমহাদেশের দু'জন প্রখ্যাত শিল্প–রসিক এবং শিল্পতত্ত্ববিদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁদের সঙ্গে বহুবিধ আলোচনায় আমি শিল্প বিচারের পাঠ গ্রহণ করেছি। এঁদের একজন হচ্ছেন প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দী, যিনি এখন লোকান্তরিত এবং অন্যজন হচ্ছেন ডাঃ মূলক্ রাজ আনন্দ, যিনি এখন বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে। আমি 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছি যা পশ্চিমবঙ্গেও সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। এ গ্রন্থটি মূলত আমার কতকগুলো বক্তৃতার সমষ্টি। এই বক্তৃতাগুলো আমি দিয়েছিলাম শিল্পকলা একাডেমীতে। এই গ্রন্থটি আমাকে খুব তৃপ্তি দিয়েছে। এ ধারায় আরও কয়েকটি গ্রন্থ লিখতে পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু সময় হয়ে উঠছে না।

প্রশ্নঃ আপনার একমাত্র উপন্যাস 'জিন্দাবাহারের গলি' প্রকাশিত হওয়ার পর বেশ আলোচিত হয়েছে। অনেকে অশ্লীলতার প্রশ্নও তুলেছেন। সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রসঙ্গটি অনেক পুরনো। এসব ব্যাপার নিয়ে

www.pathagar.com

মামলা-মোকদ্দমাও হয়েছে অনেক। যৌন সমস্যার প্রাধান্য পেলেই কি সাহিত্য অশ্লীল হয়ে যাবে? আপনি কি মনে করেন? আর কোনো উপন্যাস লিখবেন না?

উত্তরঃ সাহিত্যকর্মের সূত্রপাতে আমি এক সময় গল্প এবং উপন্যাস লিখবার চেষ্টা করেছিলাম। আমার কিছু গল্প মাসিক 'মোহাম্মদী' এবং 'সওগাত'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলো সব ১৯৪০-এর দিকের কথা।

একটি উপন্যাসও লিখেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম 'ইহাই স্বাভাবিক'। উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। এতেই বুঝতে পারা যাবে যে আমি কথা সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার বাসনা রেখেছিলাম। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম যে, আমার বন্ধু শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এবং আবু রুশদ, গল্প লেখক হিসেবে যেভাবে খ্যাতি পেয়েছেন সেই খ্যাতি আমার হবে না। সুতরাং কবিতার ধারাকেই আমার প্রধান ধারা বলে মেনে নিলাম।

'জিন্দাবাহারের গলি' মূলত আমার শৈশবকালের কাহিনী। এটাকে উপন্যাস আকারে আমি প্রকাশ করেছি। নয় বছর বয়সে মা-বাবার সঙ্গে আমি চিরকালের জন্য গ্রাম ছেড়ে ঢাকা শহরে এসেছিলাম। তখনকার কথা এ বইটিতে বলা আছে। আমি বইটিতে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, পৃথিবীতে ভাল-মন্দ পাশাপাশি থাকে। পাপ এবং পুণ্য পরস্পরকে আশ্রয় করে অগ্রসর হয় এবং মানবতার একটি বিন্দুতে সবই একসময় হয়তো মিলিত হয়। এ বইয়ের মধ্যে নিম্নমানের চরিত্রের পরিচয় সূত্রে কিছু খোলামেলা কথা আছে। মহিলা পাঠকদের কেউ কেউ সেগুলোকে অশ্লীল বলেছে এবং আমার মত লোক কি করে এত অশ্লীল কথা লিখতে পারে এ কথা তারা বলেছে। একটি বিশেষ শ্রেণীর জীবনের কথায় যে কথাগুলো স্বাভাবিকভাবে আসে সেগুলোকেই আমি ব্যবহার করেছি।

এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় পর্ব আমি লেখা আরম্ভ করেছি। কিন্তু শেষ করতে পারিনি। আদৌ শেষ করতে পারব কিনা বলতে পারি না।

যৌন চেতনাকে উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হয় সেগুলোই অশ্লীল। কিন্তু যৌনাবেগ জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। জীবনের প্রয়োজনে যৌনতাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। তা কখনও অশ্লীল নয়। ডি. এইচ. লরেন্সের 'লেডী চ্যাটার্লীজ লাভার' গ্রন্থটি অশ্লীল নয়। হেনরী মিলারের 'ট্রপিক অব ক্যান্সার' উপন্যাসটি অশ্লীল নয়। তেমনি ফিলিপ রথ-এর 'দি প্রফেসর অফ ডিজায়ার' উপন্যাসটিও অশ্লীল নয়। শেষের দুটি উপন্যাসে কামনার বিকার অদ্ভুত মানসিকতার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়েছে। শেষের দুটি গ্রন্থ আধুনিক ইংরেজী ভাষাশৈলীর এক অপূর্ব নিদর্শন।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ 'চর্যাগীতিকা', 'মধুমালতী' ও 'পদ্মাবতী'র ন্যায় মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা গ্রন্থ আপনি রচনা করেছেন। এছাড়া রয়েছে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'। এসব গবেষণায় আপনার মৌলিকত্ব বা স্বাতন্ত্র্য কোথায়?

উত্তরঃ আমার প্রথম গবেষণাগ্রন্থ 'পদ্মাবতী'। এই গ্রন্থের মাধ্যমেই আমি প্রথম বাংলা সাহিত্যে তুলনামূলক সমালোচনা প্রবর্তন করি। মালিক মোহাম্মদ জাইসী-এর 'পদুমাবত' কাব্যের সঙ্গে আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যের বিস্তৃত তুলনা করে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। উপরন্তু উভয় ভাষার মূল পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে গ্রহণযোগ্য পাঠ নির্মাণ করতে হয়েছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমার গ্রন্থটিকে মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। পুরনো পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠ উদ্ধারের ক্ষেত্রে আমি কিছু নীতি প্রবর্তন করেছি যা পরবর্তীতে গবেষকদের কাছে আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। 'মধুমালতী' সম্পাদনাও একটি তুলনামূলক আলোচনা গ্রন্থ। এক্ষেত্রে ফারসী পাণ্ডুলিপির সঙ্গে বাংলা পুঁথির পাঠ মিলিয়ে আমি 'মধুমালতী'র পাঠ নির্মাণে সচেষ্ট ছিলাম। আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্তে এবং পূর্ণ অধিকারে বলব যে, বাংলা ভাষায় মধ্যযুগ নিয়ে মৌলিক গবেষণা একমাত্র আমিই করেছি।

চর্যাগীতিকার প্রতি আমার আকর্ষণ দীর্ঘকালের। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'চর্যাগীতিকা' আমি প্রকাশ করেছিলাম বাংলা একাডেমী থেকে। উক্ত গ্রন্থে আমার একটি ভূমিকাও আছে। আমার নিজস্ব 'চর্যাগীতিকা প্রসঙ্গে' গ্রন্থটি সম্পর্কে আমি একথা বলতে পারি যে, হিন্দীতে চর্যাগীতিকা নিয়ে যত কাজ হয়েছে সেগুলো পূর্ণভাবে আমার আয়ত্তে ছিল এবং সেক্ষেত্রে সাংকৃত্যায়ন এবং ধর্মবীর ভারতী—এঁদের রচনা পরীক্ষা করার সুযোগ আমার হয়েছিল। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে বাংলা ভাষায় সরহপার 'দোহাকোষ' নিয়ে আমার আলোচনাটিই একমাত্র ও প্রথম আলোচনা।

'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' যেটা আমি লিখেছি সেখানে আমার মৌলিকত্ব এই যে, আমি সেখানে সাহিত্যের বিশ্লেষণ দিয়েছি। এ গ্রন্থটি শুধুমাত্র সাহিত্যের ইতিহাস নয়, তার অতিরিক্ত কিছু।

প্রশ্নঃ নানা সূত্রে আপনি বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। আপনার বিদেশ ভ্রমণের অনেক অভিজ্ঞতা আপনার অনেক রচনায় বিধৃত হয়েছে। কিন্তু আপনি ভ্রমণকাহিনী রচনা করেননি। আমাদের দেশের ভ্রমণসাহিত্য সম্পর্কে আপনি কিছু বলবেন কি?

www.pathagar.com

উত্তরঃ আমি ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে প্রথম বিদেশে যাই। আন্তর্জাতিক লেখক সংঘ বা পি.ই.এন.এর আমন্ত্রণক্রমে লণ্ডনে গিয়েছিলাম এবং সম্মেলন শেষে লণ্ডন থেকে প্যারিসে। এই প্রথম ভ্রমণে অনেক বিশ্ববিখ্যাত লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ই. এম. ফরস্টার, স্যার কমটন ম্যাকেঞ্জী, আলবার্তো মোরাভিয়া, স্টিফেন স্পেন্ডার, আদ্রে শাঁসো এবং ক্লেয়ার গল। পরের বছর যাই মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে এবং জাপানে। এভাবেই দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমার নিয়মিত বিদেশযাত্রা ঘটেছে। 'প্রেম যেখানে সর্বস্ব' নামে আমার একটি ভ্রমণকাহিনী আছে। এ ভ্রমণকাহিনীতে লণ্ডনের কথা, প্যারিসের কথা, জাপান ও ব্রাজিলের কথা এসেছে। সুতরাং ভ্রমণকাহিনী রচনা করিনি একথা সত্য নয়। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে একটি নতুন প্রকাশকের হাতে বইটি দিয়েছিলাম যার ফলে বইটি যথার্থভাবে বাজারজাত হতে পারেনি।

বাংলা ভাষায় ভ্রমণকাহিনী অনেকগুলো লিখিত হয়েছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনী মাত্র কয়েকটি। রবীন্দ্রনাথের পর যাঁরা ভ্রমণকাহিনী রচনায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্নদাশংকর রায় এবং সতীনাথ ভাদুরীর নাম করা যেতে পারে। অন্নদাশংকর রায়ের 'পথে প্রবাসে' এবং সতীনাথ ভাদুরীর 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী' দুটি অসাধারণ গ্রন্থ।

বাংলাদেশে যাঁরা ভ্রমণকাহিনী রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সানাউল হকের 'বন্দর থেকে বন্দরে' বইটি অত্যন্ত সুন্দর। সলিমুল হক খান মিল্‌কী নামে এক ভদ্রলোক তাঁর বিলেতে অবস্থানের কথা একটি বইতে বর্ণনা করেছেন। বইটি ভাল কিন্তু এর নাম আমার মনে নেই।

প্রশ্নঃ আপনি যখন সাহিত্য চর্চা শুরু করেন তখন আপনার সমসাময়িক কবি আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন, কথাশিল্পী আবু রুশদ, শওকত ওসমান এঁরাও সাহিত্য চর্চায় লিপ্ত ছিলেন। এঁদের সকলের সঙ্গেই আপনার সাহিত্য ও ব্যক্তি জীবনে ঘনিষ্ঠতা ছিল। সাহিত্য জীবনের শুরুতে আপনি এঁদেরকে কিভাবে পেয়েছিলেন?

উত্তরঃ আমার শিক্ষা-জীবন কেটেছিল ঢাকায়। কিন্তু ১৯৩৮ সাল থেকেই আমি কলকাতায় যাতায়াত করছি। সেই সুবাদে তৎকালীন মুসলমান সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার পরিচয় এবং অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। ঢাকায় স্কুলে আমার সহপাঠী এবং বন্ধু ছিল মাহবুবুর রহমান খাঁ। তার খালাতো ভাই ছিল গোলাম কুদ্দুস। সে কলকাতায় বাগবাজারে তার মামার বাসায় থেকে পড়াশোনা করত। মাহবুবের সঙ্গে আমি প্রথম কলকাতায় যাই ১৯৩৭ কি ৩৮ সালে। সেবারেই গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গে আমার পরিচয়। ১৯৪০ এর

www.pathagar.com

দিকে যখন আমি লেখক হিসেবে অনেকটা পরিচিত এবং অংশত স্বীকৃত সে সময় শওকত ওসমান, আবুল হোসেন, আবু রুশদ, সিকানদার আবু জাফর, কাজী আফসার উদ্দিন আহমদ এঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কি করে যেন ফররুখ এবং কাজী আফসার উদ্দিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। শওকত ওসমান আমার এক ভগ্নিপতির অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিল। ভগ্নিপতি কলকাতায় থাকতেন। সেখানেই শওকত ওসমানের সঙ্গে পরিচয় এবং পরে কলকাতা থাকাকালীন সময়ে একটি নিবিড় সখ্যে পরিণত হয়। আহসান হাবীবের সঙ্গে পরিচয় হয় আরও পরে। আহসান হাবীব যখন অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে যোগ দেয় তখন আমিও সেখানে যোগ দেই। আমি শিক্ষা সদনের পরিচালকরূপে, আহসান হাবীব স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে। সে সময়কার অন্তরঙ্গতা স্বপ্নের মতে মনে হয়। তখন রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা এবং বিশ্বাস আমাদের একজনকে অন্যের প্রতি বিরক্ত করেনি। আমরা একে অন্যের লেখা পড়তাম। একে অন্যকে মানবিক সম্পর্কে গ্রহণ করতাম। হৃদয়ের প্রাচুর্যে আমরা একে অন্যকে আশ্রয় করে থাকতাম। আহসান হাবীব শুধুমাত্র নিজকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকত। তার ফলে তার সঙ্গে কারও খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা ঘটেনি। সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের কারোরই চিন্তা চৈতন্যে বিরোধ ছিল না। আমার সঙ্গে নির্মল এবং পরিচ্ছন্ন বন্ধুত্ব অব্যাহত ছিল ফররুখ আহমদ, কাজী আফসার উদ্দিন এবং সিকানদার আবু জাফরের। এখনও বন্ধুত্বের সম্পর্ক পূর্ণভাবে বজায় আছে আবু রুশদের সঙ্গে।

প্রশ্নঃ সৃষ্টিশীল রচনার পিছনে প্রতিটি লেখকেরই সম্ভবত একটি দায় থাকে, একটি লক্ষ্য বা কমিটমেন্ট। আপনি কোন্ দায় থেকে লেখালেখি শুরু করেন?

উত্তরঃ জীবনক্ষেত্রে একটি বিশ্বাসকে আবিষ্কার করা এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করাই আমার লক্ষ্য ছিল। পারিবারিকসূত্রে একটি বিশ্বাসকে আমি পেয়েছিলাম। সে বিশ্বাসকে বহুবিধ প্রেক্ষাপটে আমি যাচাই করার চেষ্টা করেছি। 'পদ্মাবতী' নামক গবেষণা গ্রন্থে সূফীতত্ত্বের যে সারাৎসার আছে তাকে আমি উদঘাটন করেছি। আমার কবিতার মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়েও একটি গৃহীত বিশ্বাসের স্থিতি ছিল। পরবর্তীতে সংশয় এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বিশ্বাসকে নতুন করে আবিষ্কার করার প্রয়াস পেয়েছি। রাজনৈতিক চেতনা অথবা দ্বন্দ্বমুখর সামাজিক চেতনা আমার কবিতায় রূপলাভ করেনি। তবে মানুষ হিসেবে আমার একটি অস্তিত্ব আছে, একটি বিশ্বাসের সাহায্যে সত্যের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজন আছে। এসব কিছুই আমার রচনার মধ্যে অনুসন্ধান করলে পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ লেখক হিসেবে আপনি বহুমুখী। আপনি এই বিচিত্র লেখাগুলো কিভাবে সম্পাদন করেন?

উত্তরঃ আমি জীবনে খেলাধুলা করিনি, আমার একমাত্র অবলম্বন ছিল বই। আট-ন বছর বয়স থেকে বইয়ের প্রতি আমার আগ্রহ। আরেকটি কথা এখানে বলা দরকার। আমার জীবনে স্মৃতির অধিকারটি অত্যন্ত প্রবল। যে বই পড়ি সেই বইয়ের কিছু না কিছু আমার মনে থাকে। এর ফলে কথাবার্তার সময় বিভিন্ন তথ্য আমি উপস্থিত করতে পারি এবং তথ্যগত বিশ্লেষণ করতে পারি। আমি যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র তখনই ইংরেজী ভাষার উল্লেখযোগ্য লেখকদের বই পড়ে শেষ করেছিলাম। সে সময় বার্নাড শ এবং গলসওয়ার্দীর লেখার প্রতি আমার খুব আগ্রহ ছিল। কারও হয়তো বিশ্বাস হবে না কিন্তু কথাটা সত্যি যে, সে বয়সে এদের সব লেখা আমি পড়ে শেষ করেছিলাম, এর ফলে আমার জানার পরিধিটি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে আমি মুখে মুখে বলে আমার অধিকাংশ বইগুলো রচনা করেছি। নিজ হাতে লিখিনি, মুখে বলেছি এবং একজন লিখেছে। এর ফলে আমার রচনার মধ্যে একটা দ্রুততা এসেছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে বক্তব্যকে পূর্ণতা দিতে সক্ষম হয়েছি। শুধুমাত্র গবেষণাধর্মী বইগুলোর ক্ষেত্রে মুখে বলা খুব কাজ দেয়নি। সে ক্ষেত্রে আমাকে চিন্তা করে লিখতে হয়েছে। কবিতাও আমি ডিকটেশনে লিখিনা। সেখানে নিজের হাতের লেখাটি প্রবল হয়ে দেখা দেয়।

প্রশ্নঃ সাহিত্যে প্রগতিশীল ধারা বলে একটি কথা আছে। আপনার সাহিত্য জীবনে এই ধারার সঙ্গে কোন পরিচয় হয়েছে কি?

উত্তরঃ প্রগতিশীল শব্দটি বামপন্থী রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে সংযুক্ত। মূলত প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে যখন রাজনৈতিক চিন্তাধারা সাহিত্যে প্রশ্রয় পেতে থাকে সে সময়ের মধ্যে প্রগতির উৎস। পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এটি একটি সুস্পষ্ট রূপ পায়। রবীন্দ্রনাথের সময় আমরা আধুনিক এবং রোমান্টিক এই শব্দ দুটি খুব শুনতাম। প্রগতি শব্দটির সাহিত্য শাসনের ক্ষেত্রে রূপ পেতে আরম্ভ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে। যেসব বামপন্থী দল এ শব্দটি ব্যবহার বা আরম্ভ করে তারা এই প্রচারে শব্দটি ব্যবহার করতে থাকে যে তারাই একমাত্র প্রগতিবাদী, আর কেউ নয়। এটা একটা হাস্যকর চিন্তা। তবু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রগতি সাহিত্য গোষ্ঠী নামে দল গড়ে উঠেছিল এবং তাদের মধ্যে কিছু ভাল লেখকও ছিল। ঢাকায় ১৯৪০ সালের দিকে কিরণ শংকর সেনগুপ্ত প্রগতি সাহিত্য সংঘের একজন প্রধান কর্মী ছিলেন। তার সঙ্গে আমি এই সংঘের

www.pathagar.com

বহু সভায় গিয়েছি এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছি। তৎকালীন প্রগতি আন্দোলনের ইতিহাস আমি জানি। তাঁদের কর্মকাণ্ডে কখনও কখনও অংশগ্রহণ করেছি বটে কিন্তু তাদের চিন্তার মধ্যে আমি হারিয়ে যাইনি।

প্রশ্নঃ সাহিত্যে প্রতিক্রিয়াশীলতা বলতে কি বোঝায়? আমাদের সাহিত্যে তার লক্ষণসমূহ কি কি?

উত্তরঃ প্রতিক্রিয়াশীল শব্দটিও অত্যন্ত সরবে রাজনৈতিক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। যার লেখা পছন্দ করিনা, তাকে আক্রমণ করার সহজ পন্থা হচ্ছে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলা। আমাদের দেশের তথাকথিত কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী এই শব্দটি যত্রতত্র ব্যবহার করেন এবং নিজেদের মস্তিষ্কশূন্যতা প্রমাণ করেন। এ্যারিস্টোটলের চিন্তাধারা মত সবকিছুই তো প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া না থাকলে সাহিত্য সৃষ্টিই অসম্ভব। ফুল দেখি এবং দেখে আনন্দিত হই। এটা এক ধরনের প্রতিক্রিয়া; অন্যায় দেখি এবং ক্ষুব্ধ হই এবং এটাও এক ধরনের প্রতিক্রিয়া; যুবতী দেখি এবং কামনায় জর্জরিত হই। এটা তো প্রতিক্রিয়া, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা তো প্রতিক্রিয়া রূপেই ঘটে।

যারা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবার জন্য এ শব্দটি বারবার ব্যবহার করেন আসলে তাদের এই প্রয়োগ বিধিটাই প্রতিক্রিয়াশীল।

প্রশ্নঃ সমস্ত পুরস্কারই আপনি পেয়েছেন। নাম করে বলার আর দরকার নেই। আপনাকে বলা যায় একজন সফলকাম ব্যক্তি যার আর কিছু পাবার নেই। আপনার কি মনে হয়?

উত্তরঃ আমি আমাদের দেশের সব ক'টি জাতীয় পুরস্কারই পেয়েছি, বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছি, একুশের পদক পেয়েছি এবং স্বাধীনতা পদক পেয়েছি। স্বাধীনতা পুরস্কারটি আমাদের দেশের মহত্তম পুরস্কার। এসব পুরস্কার পাবার পর নতুন কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা আমার নেই। দেশ যে আমাকে সম্মানিত করেছে সেজন্য দেশের কাছে আমি ঋণী।

প্রশ্নঃ সাহিত্যের ভাষা কি হওয়া উচিত? মুখের ভাষা এবং গ্রন্থের ভাষা অভিন্ন হলে কি কোন সমস্যার সৃষ্টি হবে?

উত্তরঃ আমাদের সাহিত্যে বর্তমানে পরিশীলিত চলতি বুলি ব্যবহৃত হয়। সাধু বাংলা এখন আর ব্যবহার হয় না। তবে কখনও কখনও আমরা সংলাপে আঞ্চলিক বুলি ব্যবহার করি। কবিতায়ও আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগের প্রয়াস দেখা যায়। আমাদের দেশে সাহিত্যের একটি ভাষা গড়ে উঠেছে যা আমাদের শিক্ষিতজনের মুখের ভাষা থেকে গড়ে উঠেছে। তাই বলে তা দৈনন্দিন সংসার ও সমাজকর্মের ভাষা নয়। সাহিত্যের ভাষা কি হবে তার

www.pathagar.com

নির্দেশনা সাহিত্যের বিষয়বস্তুই ঠিক করবে। বিষয়বস্তুই তার ভাষাকে গড়ে তোলে এবং একটি বিশেষ প্রকৃতির ভাষার শাসন নির্মাণ করে।

প্রশ্নঃ আপনার সাহিত্য জীবন ঘটনাবহুল। এই ঘটনাবহুল জীবনে আপনি প্রচুর দেশী ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে গিয়েছেন। অনেকের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে, আবার অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। আমরা জানতে চাই এইসব অভিজাত পরিচয় আপনার মানস গঠন, আপনার রুচি ও বোধের বিকাশে কোন ইতিবাচক প্রভাব কি ফেলেছে?

উত্তরঃ আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীতে কোনো কিছুই হারায় না, কোনো কিছুই ফুরিয়ে যায় না। সবকিছুই কোনো না কোনো রূপে বিদ্যমান থাকে — হয়তো রূপের পরিবর্তন হয়, নয়তো আকৃতির পরিবর্তন হয়। জীবন ক্ষেত্রে একজন মানুষ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সে অভিজ্ঞতাই তার জীবনকে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। আমি জীবনে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। বর্তমানে আমার যে পরিচয় সে পরিচয় নির্মাণে এ অভিজ্ঞতাগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। একটি উদাহরণ দেই। চল্লিশের দশকে আমি যে ধরনের লেখা লিখতাম, ছাপ্পান্ন সালের পর থেকে সে ধরনের লেখা থেকে আমি বহুদূরে সরে এলাম। বলা যেতে পারে একটি বিপরীত মেরুতে অবস্থান নিলাম। চল্লিশের দশকে লেখা 'চাহার দরবেশ' এবং ছাপ্পান্ন সালের পরে লেখা কবিতাগুলো যা 'অনেক আকাশ' বইতে পাওয়া যাবে এ দু'য়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। ছাপ্পান্ন সালের পর থেকে আমার বোধের রাজ্যে প্রচণ্ড পরিবর্তন এসেছে। এ পরিবর্তন এসেছিল ইউরোপের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে। বিশেষ করে, ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের সাথে সম্পর্কের ফলে।

প্রশ্নঃ আপনার পরবর্তী প্রজন্মের লেখক কিংবা তার পরবর্তী তরুণ লেখককুল কিংবা বর্তমানে যারা নতুন লেখক হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে তাদের রচনার সঙ্গে কি আপনার পরিচয় আছে? আপনি কি তাদের লেখা পড়েন?

উত্তরঃ আমি তরুণ লেখকদের লেখা পড়ি। আমার নিজের দায়িত্বে তাদের লেখা যোগাড় করি। তবে এখন তরুণদের স্বভাবের মধ্যে একটি অবজ্ঞার ভাব লক্ষ্য করি। তারা তাদের বই প্রবীণদের হাতে পৌঁছে দিতে চান না। তার ফলে অনুসন্ধান করে তাদের বই আমাকে যোগাড় করে নিতে হয়। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের তরুণদের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বলতে চাচ্ছে। তাদের আগ্রহ এবং নিষ্ঠা আছে। আমি বিশ্বাস করি যে, তারা ভবিষ্যতে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবে।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ কবিতা লেখার ক্ষেত্রে আপনি কি কোনো অনুপ্রেরণা সম্পর্কে ভাবেন? অনুপ্রেরণা বলে কিছু আছে কি?

উত্তরঃ আমার কবি জীবনে রমণী একটি প্রেরণাদায়িনী শক্তি। এই রমণীর মধ্যে আমি মাতা, ভগ্নী, কন্যা এবং প্রিয়তমা সকলকেই গণ্য করি। এর বাইরে যে সমস্ত চিন্তা উপলব্ধি বা বিষয় আমাকে অনুপ্রেরণা দেয় তা হচ্ছে প্রকৃতি, ইতিহাস এবং ধর্ম বিশ্বাস।

প্রশ্নঃ আপনার সাহিত্যে কার প্রভাব সবচেয়ে বেশি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ আমার সাহিত্য জীবনে সবচেয়ে বড় প্রভাব ছিল আমার মা'র এবং তারপরে আমার স্ত্রীর। কেউ এখন আর নেই কিন্তু এদের স্মৃতি আছে।

প্রশ্নঃ পারিবারিক জীবনে আপনার সবচেয়ে বড় বন্ধু কে?

উত্তরঃ পারিবারিক জীবনে আমার স্ত্রীই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিলেন। এখন তিনি নেই। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই তাঁর স্মৃতি আমার কাছে প্রত্যক্ষ।

প্রশ্নঃ আপনার গোটা জীবনে কে আপনাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছে?

উত্তরঃ আমার মা এবং বাবা উভয়েই। যাঁরা আমার আত্মজীবনী 'স্রোতবাহী নদী' পাঠ করেছেন অথবা 'উচ্চারণ' কাব্যগ্রন্থ অথবা 'জিন্দাবাহারের গলি' পাঠ করেছেন, তাঁরাই আমার কথার তাৎপর্য বুঝবেন।

প্রশ্নঃ আপনার জীবনে রাজনীতির গুরুত্ব কতটুকু কিংবা আপনার সাহিত্যে? সাহিত্যে রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশ করা কি অযৌক্তিক? আপনার কি মনে হয়?

উত্তরঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে আমি এম. এন. রায়ের র‍্যাডিকেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাথে যুক্ত হই। যে দু'জন আমাকে এই রাজনৈতিক অঙ্গনে টেনে এনেছিলেন তাঁরা ছিলেন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা এবং প্রাণগোপাল পাল। মাঝে মাঝে মরহুম আবুল হাশেমের মুসলিম লীগ কর্মকাণ্ডে আমি যোগ দিয়েছি। এরপর পাকিস্তান আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছি। আবার বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছি। আমার কবিতায় গৌণভাবে এগুলোর প্রভাব পড়েছে। আমি বিশ্বাস করি রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং চিন্তা সাহিত্যকে প্রভাবিত করতে পারে কিন্তু সাহিত্য কখনও রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রকাশের অস্ত্র হবে না।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ মুক্তিযুদ্ধের উপর আপনার অনেক লেখা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আপনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং সক্রিয় ভূমিকাও রেখেছেন। যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় আজ স্বাধীন বাংলাদেশে সাহিত্যে, শিল্পে, কবিতায় কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন কি আপনি দেখতে পান? আপনার রচনায় মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?

উত্তরঃ আমরা বিপর্যয় থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। আমাদের জীবনে অনেক দুর্ঘটনা এসেছে। বিপুল হত্যাযজ্ঞের পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অল্প কিছুদিন যেতেই ভাষা আন্দোলন ঘটলো। তারপর স্বাধীনতা আন্দোলন। আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এই সমস্ত ঘটনা কোনো গভীর এবং চিরকালীন প্রভাব বিস্তার করেনি। লক্ষ্য করি যে, মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সর্বস্ব পণ রেখে দেশকে যাঁরা স্বাধীন করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন তাঁদেরকে অপমানিত করে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি সাহিত্যের অঙ্গন দখল করবার চেষ্টা করছে। একটি প্রকাশনী সংস্থা মুক্তিযুদ্ধের কবিতা নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে যার মধ্যে আমরা যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম তাঁদের কোনো কবিতা নেই, বরঞ্চ এমন সব লোকের কবিতা আছে যারা দেশের অভ্যন্তরে থেকে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম যখন সে সময়কার অভিজ্ঞতা নিয়ে 'আমার প্রতিদিনের শব্দ' নামে আমার একটি কাব্যগ্রন্থ আছে। আমি একথা বলি না সর্বদাই আমরা মুক্তিযুদ্ধকালীন সংঘর্ষের কথা ভাবব। দু'টি বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে এবং দুটি যুদ্ধেই জার্মানী এবং ইংল্যাণ্ড একে অপরের বিরোধী পক্ষ ছিল। কিন্তু এখন সমৃদ্ধ ইউরোপ গড়ার কাজে একে অন্যের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করছে। আমাদেরও এখন কর্তব্য এককালীন বিরোধের কথা বারবার উচ্চারণ না করে দেশ গড়ার কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখা। শূন্যতা এবং বিক্ষোভ নিয়ে রাজনীতি হয় না, দেশও নির্মিত হয় না। আমাদের এখন প্রয়োজন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পদ বৃদ্ধি করা, মেধাকে যথার্থ সৃষ্টিতে ব্যয় করা। কোনো রাজনৈতিক দল হয়তো এদেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধের আবেগ মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে পারে। আবার কোনো রাজনৈতিক দল হয়তো একমাত্র আবেগকে সম্বল করে বিক্ষুব্ধতার জন্ম দিতে পারে। কোনোটাই কাম্য নয়।

বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কিছু গ্রন্থ বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো সবই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে এই গ্রন্থগুলো বিশেষ মূল্যবান। সরকারীভাবে মুক্তিযুদ্ধের দলিলগুলো মুদ্রিত হয়ে

www.pathagar.com

প্রকাশিত হয়েছে। ভবিষ্যতে যাঁরা গল্প, উপন্যাস, কবিতা লিখবেন তাঁরা এ সমস্ত গ্রন্থ থেকে উপকরণ এবং উদ্দীপনা সংগ্রহ করতে পারবেন। মুক্তিযুদ্ধের উপর আমার নিজ অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা 'যখন সময় এল।' এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্নঃ আপনার খ্যাতি কি আপনাকে কখনো কখনো অহমিকাপূর্ণ করে তোলে? মানুষের কাছ থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে দেয়? আসলে খ্যাতি সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

উত্তরঃ যাঁরা আমাকে জানেন তাঁরা সত্যিই জানেন যে, আমার মধ্যে কোন অহমিকা নেই। যে কোনো মানুষ, যে কোনো সময় আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে। মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় আমার কোনো দ্বিধাবোধ নেই। খ্যাতিটা হচ্ছে মানুষের কৃতির সাক্ষ্য এবং কৃতিকে সমাজ যে গ্রহণ করল তার একটি সমর্থন। কিন্তু তাই বলে আমি যে একটি মানুষ সেই মানুষের মানবিক চেতনাগুলো তার কৃতি কখনও আড়াল করতে পারে না। আমি যে এলাকায় থাকি সে এলাকার সাধারণ ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখলেই আমার কাছে ছুটে আসে, সময় থাকলে আমি তাদের সাথে কথা বলি। আমার কর্মজীবনের বাইরে এগুলোই আমার সান্ত্বনা। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আমি কখনই দূরে সরে যাইনি। অনেকে হয় তো বিশ্বাস করবেন না যে, ধনী লোকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই কম, সামাজিকভাবে তাদের কাছ থেকে আমি খুবই দূরে থাকি।

www.pathagar.com

সৈয়দ আলী আহসানের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর

মাহমুদ শাহ কোরেশী

প্রশ্ন ঃ ১৯৯৪-এর ২৬ মার্চ আপনার ৭৩তম জন্মদিন। এই দিনে আপনার মনে এমন কোন্ অনুভূতি জাগছে যা আগে অনুভূত হয়নি?

উত্তর ঃ একবার শাহেদ সোহরাওয়ার্দীকে এক মহিলা করাচীতে এক বিদেশী ব্যালের আসরে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিলেন ঃ "অনেক দিন মনে রাখার মত এই ব্যালেটি। আপনি খুশী হবেন।" সোহরাওয়ার্দী সাহেব হেসেছিলেন এবং সংক্ষেপে বলেছিলেন, "আমার স্মৃতির সঞ্চয় প্রচুর। নতুন সঞ্চয়ের আর আমার প্রয়োজন নেই। আর অনেক দিন যে আমি মনে রাখব সে অনেক দিন তো আমি আর পাব না।" আমিও একই কথা বলব। আমার সামনে তাকাবার সময় নেই। আমি আমার পিছনের অজস্র সঞ্চয় নিয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছি এবং সামনে সময় কম বলে বর্তমানে খুব ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। প্রতিদিন সকার-বিকেল দু'বেলাই আমার লেখা এবং পড়ার কাজ চলে। এই ব্যস্ততার ফলে আমি কোন প্রকার কর্মহীন অবকাশের শূন্যতাকে অনুভব করি না। শুধু অবকাশ যাপন আমার জন্য একেবারে অসম্ভব। অবকাশ অবসাদ আনে এবং জীবনে সময় হারানোর দুঃখকে বড় প্রবল করে। আমার সময় কম বলে আমি সময় হারাতে চাই না। বয়স বাড়লে মানুষের অভিনিবেশের প্রয়োজন হয়। এক সময় যেখানেই আমন্ত্রিত হতাম সেখানেই যেতাম এবং কথা বলতাম অজস্র। লোকেরা বলে- আমি নাকি সুন্দর কথা বলি এবং মানুষকে তন্ময় রাখি। মানুষের এ কথায় আমি তৃপ্তি পেতাম এবং তাই সুযোগ পেলেই যেখানে কথা বলবার অবকাশ আছে সেখানেই যেতাম। এখন কথা বলবার আমন্ত্রণ পুরোপুরি উপেক্ষা করি। এখন আমার সমস্যা যে বিদায়ের আগে পৃথিবীতে আমি কি রেখে যাচ্ছি এবং বিধাতার সামনে যখন উপস্থিত হব তখন কি সঞ্চয় নিয়ে উপস্থিত হব। আমি বর্তমান সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের মানুষের জীবন যাপনের নীতি এবং বিশ্বাসকে পরীক্ষা করে দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনকে জিজ্ঞেস করছি যে আমি আমার জীবনে বিশ্বাসকে আদৌ পেয়েছি কিনা এবং পেয়ে থাকলে কিভাবে পেয়েছি। আমি সম্প্রতি রাসূলে খোদার একটি জীবনী লেখা শেষ করেছি। এই বইটি লিখতে আমার তিন মাস সময় লেগেছে। পৃথিবীর সকল সময়ের মানুষের জন্য একজন অসাধারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানুষ যে সত্য ও আনন্দকে রেখে গেছেন, সে সত্য এবং আনন্দের অনুসন্ধান ছিল আমার এ জীবনী লেখার উদ্দেশ্য। কতটা সফলকাম হয়েছি জানিনা তবে তৃপ্তি পেয়েছি প্রভূত। মানুষ পৃথিবীর কর্মে নিযুক্ত থেকে কখনও জানে না যে যথার্থ বিশ্বাসের উপঢৌকন কি এবং কৃত্তিমতাহীন সত্যের দীপ্তিই বা কি রকম। এখন আমার সংসার নেই, কোন

www.pathagar.com

প্রকার বিধিবদ্ধ কর্মেরও শাসন নেই, তাই আমি এখনকার সময়ের সীমানার মধ্যে নিজেকে এমনভাবে ব্যস্ত রাখতে চাই যাতে শূন্যতার অসহায়তা আমাকে যেন স্পর্শ না করে।

প্রশ্ন ঃ ১৯৭০, ১৯৮২ এবং ১৯৮৫তে আপনার অনুরাগীরা খুব ঘটা করে আপনার জন্মদিন উদযাপনের আয়োজন করে। সেগুলো কি মামুলি অনুষ্ঠানমালা ছিলো, না আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে তা তাৎপর্যবহ বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ অতীতে আমার জন্মদিনের যে অনুষ্ঠানগুলো আমার অনুরাগীরা ব্যাপকভাবে উদযাপন করেছিলেন তার মধ্যে কোন কৃত্তিমতা ছিল না। সে সব অনুষ্ঠানে অনেক জনসমাগম হয়েছিল এবং আমন্ত্রণ ছাড়াও অনেক শুভানুধ্যায়ী উপস্থিত হয়েছিলেন। আমাদের জীবনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অনুষ্ঠানগুলো গুরুত্ব বহন করেছিল বলে মনে হয়। যারা উক্ত অনুষ্ঠানগুলোতে বক্তব্য রেখেছিলেন তারা সকলেই স্বীকার করেছিলেন যে, আমার জীবনে কোন সংশয় নেই, বিশ্বাসের অধিগম্যতা আছে, কিন্তু কোন গোঁড়ামী নেই। আমি যে আমার সমগ্র জীবনে বস্তুবাদ থেকে মানুষের মুক্তির জন্য কথা বলেছি সে কথা সকলে স্বীকার করেছেন। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে বর্তমানে খুবই বিপর্যয় চলছে। কিছু কিছু মানুষ নাস্তিক্যবাদে অহংকারী হয়েছেনএবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে নিজেদের মতাদর্শে দীক্ষিত করে জড়বাদী হিসেবে গড়ে তুলবার চেষ্টা হচ্ছে। আমাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার অর্থ হচ্ছে নাস্তিক্যবাদ ও জড়বাদের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিশ্বাসের বলয় আমি নির্মাণ করতে চেয়েছি এবং আমার অনুরাগীরা জানেন যে আমাকে গ্রহণ করলে সত্যকে গ্রহণ করার পথ উন্মুক্ত হয় এবং বিশ্বাসের প্রতাপ বৃদ্ধি পায়। আমি কবিতাকে বিশ্বাসের বিভূতি বলেছি। যারা আমার বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন তাঁরা আমার কথায় উত্তেজিত হচ্ছেন এবং আমার কণ্ঠ রুদ্ধ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু আমি কখনও এদের উচ্চকণ্ঠে ভীত হইনি। বরঞ্চ এদের উচ্চকণ্ঠকে ক্ষীণ প্রাণের আর্তনাদ বলে মনে করি।

প্রশ্ন ঃ '৮৫ সালে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও আমি আপনার ছয় দশকের জীবনকে মূল্যায়ন করেছি এভাবেঃ

"একজন বিশিষ্ট মানবতাবাদী ও সৃষ্টিশীল শক্তি গত চার দশকের বাংলাদেশের আধুনিক কবিতা সমালোচনা, সাহিত্য ও শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিদেশের বিচিত্র উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বসমূহের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব এদেশের সাহিত্য ও শিল্প জগতে একনতুন চেতনালোকে নির্মাণে সহায়ক হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার যোগদান অবদান আজ আমাদের জাতীয়

www.pathagar.com

ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়। আমাদের সৌভাগ্য বর্তমানে তার সৃজনশীলতা নতুন বাঁক নিয়েছেএবং অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি অসাধারণ সৃষ্টি প্রাচুর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন।" (সম্পাদকীয় ঃ সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ)।

এখন পরবর্তী প্রায় এক দশকের সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবীর জীবনকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

উত্তর ঃ ১৯৭৫ সালে আমি আমার সাহিত্য কর্মের পরিসরে যতটা অগ্রসর হয়েছিলাম ততটুকুতেই আমি তৃপ্ত থাকিনি। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমি অনেক কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি এবং বিভিন্ন বিষয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখবার প্রয়াস পেয়েছি। পৃথিবীর বহু বিষয়ে আমার আগ্রহ আছে এবং সকল আগ্রহ নিয়ে কথা বলবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু সময় নেই বলে সব কিছুতে হাত দিতে পারছি না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে জীর্ণতা আসে। তাছাড়া এই জীর্ণতা কর্মকুশলতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও শিল্পকলা বিষয়ে একটি বৃহৎ পরিসরের একটি গ্রন্থ আমি রচনা করেছি যা এখনও ছাপা হয়নি। এ গ্রন্থের নাম রেখেছি- 'শিল্পের স্বভাব ও আনন্দ।' আমি আমার বিস্তৃত আলোচনায় দেখাতে চেয়েছি যে, শিল্পকলা মানব সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং বিভিন্ন জাতির ধর্ম বিশ্বাস শিল্পকলাকে প্রভাবিত করে। আমার 'শিল্পবোধ ও চৈতন্য' বইটি এ সময়ের মধ্যে পরিবর্ধিত আকারে, নতুন করে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আমার অনেকগুলো লেখা প্রস্তুত হয়েছে। ঐ গ্রন্থটি দু'খণ্ডে প্রকাশিত হবে। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ইতিহাসএবং মধ্যযুগের ইতিহাস আমি প্রস্তুত করেছি। প্রথমটি ছাপা হচ্ছে এবং দ্বিতীয়টি এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সংস্কারের মধ্যে রয়েছে। 'চৌরপঞ্চাশিকা'' সন্দেশ-রাসক' এবং 'সরপোরী' দোহাকোষ মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সরহপার দোহাকোষটি বাংলা ভাষায় সর্ব প্রথম অনুবাদটি আমিই করলাম। এই গ্রন্থটিকে নিয়ে আলোচনার সুযোগ আছে। এসব উদাহরণ এখানে উপস্থিত করলাম, এটা প্রমাণ করার জন্য যে আমি কোন মুহূর্তেই নিশ্চেতন নই, বরঞ্চ পূর্ণ উদ্দীপনায় সব মুহূর্তেই সচেতন। আমার অনেক সমালোচক আছেন, কিন্তু তাঁরা আমার লেখার এবং ভাষার সমালোচক নন, তাঁরা শুধু কর্ম জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে অবস্থান করেছি সেগুলো নিয়ে তাঁরা আমার সমালোচনা করেন এবং আমি কি করেছি সেগুলো বিচার না করে আমি যখনকোন উক্তি করেছি যেগুলো তাঁদের মনোপুত হয়নি সেগুলোর সাহায্যে আমাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন। আমার শত্রুপক্ষীয়রা সর্বদাই দুঃখিত থাকেন যে, তাদের আক্রমণে আমি কখনও বিচলিত বোধ করি না, বরঞ্চ আমি বলে থাকি যে যারা আমাকে

www.pathagar.com

আক্রমণ করেন তারা সর্বদাই আমাকে স্মরণ করেন। তারা আমাকে মূলত শত্রুরূপে ভজনা করেন। পৃথিবীতে আমার সামনে যতটা সময় আছে সেগুলোকে আমি পুরোপুরি ব্যবহার করতে চাই এবং ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য একটি দিকনির্দেশনা দিয়ে যেতে চাই।

প্রশ্ন ঃ কেউ কেউ মনে করেন আপনার বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে। অথচ ইদানিং আপনি স্মৃতিচারণ ও অন্যবিধ রচনায় অধিকতর মনোযোগ দিয়েছেন। এর কি বিশেষ কোন কারণ আছে?

উত্তর ঃ জীবনে আমার অভিজ্ঞতা প্রচুর। বহু দেশে যাবার সুযোগ আমার হয়েছে এবং সে সব দেশের সম্মানিত এবং বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে। এই অভিজ্ঞতাকে শুধু আমার স্মৃতিতে রেখে দিতে চাই না। সে জন্যই তা আমি প্রকাশ করেছি। আমার এ সমস্ত স্মৃতিচারণমূলক রচনায় আমি যতটা সম্ভব নিজেকে আড়ালে রেখেছি এবং যে দেশে গিয়েছি সে দেশে এবং সে দেশের মানুষের বিশ্বাস এবং অভিনিবেশকে উদঘাটন করার প্রয়াস পেয়েছি। আমার স্মৃতিচারণমূলক রচনার সাহায্যে পাঠক এমন একটি সময়ের নীতি ও আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হবেন যা বর্তমান প্রজন্মে প্রায় অনুপস্থিত। আমার এই লেখাগুলোর মধ্যে সভ্যতা এবং জীবন দর্শনের এমন একটি পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে যা মানুষকে কল্যাণব্রতী করতে আগ্রহী করবে। আমার দুটি আত্মকাহিনীমূলক রচনা- 'যখন বৃষ্টি নামল' এবং 'যে যারবৃত্তে'- এ দুটি গ্রন্থের মাধ্যমে আমি বৃটিশ আমল এবং পাকিস্তান আমলের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে উন্মোচন করেছি। আমি নিজেকে অর্থাৎ আমার জীবনযাত্রার গতিধারাকে প্রাধান্য দেইনি। কিন্তু আমার পরিচয়ের বৃত্তে একটি সময়ের দিনলিপি উদ্‌ঘাটন করেছি। যাকে বলে ইতিহাসকে সঠিকভাবে উন্মোচন করার সে চেষ্টাতেই এ দু'টো গ্রন্থ আমি লিখেছি। আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করতে গেলে এ গ্রন্থ দু'টির বিশেষ প্রয়োজন হবে। দ্বিতীয়তঃ আমি আমার আত্মজীবনীমূলক রচনার মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা গদ্যের একটি বিশেষ পরীক্ষা করেছি। সমালোচনার গদ্যে যুক্তি থাকে, বিশ্লেষণ থাকে কিন্তু আত্মজীবনীমূলক গদ্যে যুক্তি ও বিশ্লেষণের চাইতে বেশী প্রবল থাকে অনুভূতি এবং বিশ্বাসের উন্মোচন। তার ফলে এ ধরনের গদ্যে একটি নতুন প্রবৃত্তির গতিধারা নির্মিত হয়। এর উপরেও আরেকটি কথা আছে। এই বই দু'টি আমার পুরোপুরি মুখে মুখে বলা। তার ফলে এর মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ আবেশ এসেছে। এ আবেশটি অন্য কোনভাবে আনা সম্ভবপর ছিল না। আমার জীবনের একটি বিশেষ সময়ে পৃথিবীর বহু মনীষীদের সাথে আমার সাক্ষাতকার ঘটেছে। সেসব সাক্ষাতকারের

www.pathagar.com

ইতিবৃত্ত মানুষের জন্য শিক্ষনীয় হবে বলে আমি মনে করেছি। একটি উদাহরণ আমি এখানে দিচ্ছি। জার্মানীর প্রিন্স কাইজারলিংক এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের খুব ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল এবং এই ঘনিষ্ঠতার ফলে রবীন্দ্রনাথ জার্মানীর অভিব্যক্তিবাদী শিল্প এবং কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। উক্ত কাইজারলিংকের পুত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল এবং সে পরিচয়ের মাধ্যমে আমি রবীন্দ্রনাথের জীবনের কিছু তথ্য জানতে পারি। এর সঙ্গে পরিচয়ের কথা যদি আমি লিখি তাহলে তার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের কিছু রচনার বিশিষ্টতা উদঘাটন করা সম্ভবপর হবে, যেমন "শিশু তীর্থ"। এভাবে করেই আমি আমার বিভিন্ন পরিচয় ইতিহাসের মাধ্যমে আমাদের কালের মানুষের কাছে কিছু তথ্য দিয়ে যেতে পারব যা ভবিষ্যতে আমাদের কবিতা এবং শিল্পের ইতিহাসে প্রয়োজনীয় উপকরণ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রশ্ন ৫। এটা বলা সম্ভবত অতিশয়োক্তি হবেনা যে, আপনার জীবন চর্চা ও সংস্কৃতি চর্চার পশ্চাৎপটে সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে ধর্মের। অথচ অন্যদিকে বিশেষ করে কাব্য সাধনা ও শিল্প ব্যাখ্যায় আপনি অনন্যরূপে আধুনিক। এতে কি কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না?

উত্তর ঃ একটি কথা আমি এর উত্তরে বলতে চাই এবং সকলকে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাতে চাই। তা হচ্ছে, ইসলাম একটি আধুনিক ধর্ম এবং এ ধর্মের আদর্শ এবং বিশ্বাসের মধ্যে পৃথিবীর মানুষকে যিনি আহবান করেছিলেন, তিনিই একজন অনন্য সাধারণ আধুনিক পুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বতোভাবে পরিচ্ছন্ন, পরিমার্জিত এবং আদর্শ পুরুষ। তাঁর কাছে জীবন ছিল মানুষের জন্য একটি ক্রমোন্নতির গতিধারা। সে ক্রমোন্নতি কি করে অর্জন করতে হয় তা তিনি তাঁর জীবনের বহুবিধ উপকরণ দিয়ে আমাদের শিখিয়েছেন। তিনি শিল্প রসিক ছিলেন। কাব্য প্রেমিক ছিলেন, সংগঠক ছিলেন, যুদ্ধে নায়ক ছিলেন, ক্ষমাশীল ছিলেন। তিনি অন্যায়কারীকে সুযোগ দিয়েছেন অন্যায় নিবৃত্ত হয়ে প্রার্থনার অধিগম্যতায় আসতে। সুতরাং আমার আধুনিকতা আমার ধর্মচর্চায় কোন ব্যাঘাত উৎপন্ন করেনি, বরঞ্চ সাহায্য করেছে। বিশ্বাসে বিনয়ে এবং অন্তর্গত চৈতন্যের সাহায্যে মানুষ আধুনিকতার উন্মোচন ঘটায়। একটি কথা আমি বিশ্বাস করি যে, আধুনিকতা কখনো বিশ্বাস এবং প্রার্থনার বিপরীত কিছু নয়। বরঞ্চ আধুনিক সময়ের জন্য বিশ্বাস প্রয়োজন এবং প্রার্থনাও প্রয়োজন। বর্তমানকালে আধুনিক বাংলা কবিতায় যে অপার 'নাস্তিক' সূচনা করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ এবং বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিগণ। আমি তাদের বিপরীত কটিতে অবস্থান করি। তিরিশের কবিগণ যে নাস্তিক্যবাদের জন্ম দিয়েছিলেন তাতে অনেকের ধারণা হয়েছিল যে,

www.pathagar.com

নাস্তিক্যবাদই একটি সঙ্গত জীবন বেদ। কিন্তু চল্লিশের দশকে প্রধানত ফররুখ এবং তারপরে আমি সুস্পষ্টভাবে একটি বিশ্বাসের বলয় নির্মাণ করার চেষ্টা করলাম এবং আমাদের কবিতা একটি বিশ্বাসের চেতনায় ভাস্বর হলো। কবিতার ক্ষেত্রে বিষয়গত আধুনিকতা বলে কোন কিছু নেই। কিন্তু প্রকাশগত আধুনিকতার একটি বিশেষ পরীক্ষা আছে। ফররুখ একভাবে এই পরীক্ষা করেছিল এবং আমি আমার মতো করে তা পরীক্ষা করেছিলাম। তাছাড়া আধুনিক ইউরোপীয় কাব্য সমীক্ষায় দেখা যাবে যে, খৃষ্টীয় ধর্মের দার্শনিক প্রজ্ঞা আধুনিক কবিতাকে লালন করেছে। দু'জন প্রধান আধুনিক কবি, টি.এস. ইলিয়ট এবং ইডিথ সিটওয়েল। কাব্য কর্মের ভঙ্গি এবং শব্দ প্রয়োগের বিশেষ কৌশলের কারণে আধুনিক আবার সঙ্গে সঙ্গে তারা খৃস্ট ধর্মের একটি সনাতন বিশ্বাসকে শব্দে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। খৃস্ট ধর্ম বলে যে প্রথম পুরুষ আদম ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করে যে পাপ করেছিলেন সে পাপ সমস্ত মানুষের শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত হয়েছে। মানুষ সর্বক্ষণ চেষ্টা করবে এবং পাপের জন্য স্বস্ত্যয়ন করতে এবং পাপগত গ্লানির কারণে প্রার্থনায় নিজেদের নিমগ্ন রাখতে। এভাবে দেখা যায় যে, কবিতায় সনাতন ধর্মীয় বোধ এবং আধুনিক উচ্চারণ ভঙ্গি একই সঙ্গে একটি বিশেষ কাব্য প্রবৃত্তির জন্ম দেয় এবং এই প্রবৃত্তিকে আমরা আধুনিক বলতে বাধ্য। সুতরাং আমি মনে করি, আমার ধর্মবোধ, আমার জীবন চেতনাকে তীক্ষ্ণ করেছে এবং আমার আধুনিকতার পথ সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন রেখেছে।

প্রশ্ন ৬। ধর্ম ব্যাখ্যায় আপনি কি 'মৌলবাদী'?

উত্তরঃ মৌলবাদ শব্দটি পাশ্চাত্য জগতের অভিধান থেকে এসেছে। পাশ্চাত্যের মানুষের জীবনে ধর্ম একটি আলাদা স্বত্বার যা কর্মজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন গীর্জার একটি শুভ সংকল্পের মতো। তাই দেখা যায়, পাশ্চাত্য জগতে পাপপূণ্য বলে কোন কথা নেই এবং সেই জগতে বিশ্বাসের কোন স্থান নেই এবং ধর্মীয় নীতিবোধেরও কোন স্থান নেই ; তাই তাদের কাছে যারা ধর্মীয় নীতিবোধের সাহায্যে জীবনকে গড়ে তুলতে চায় তারাই 'মৌলবাদী' ; যেহেতু পাশ্চাত্যের জীবন ধর্ম সাপেক্ষ নয়, ধর্মনিরপেক্ষ– তাই তাদের দৃষ্টিতে মৌলবাদ বলে একটি প্রকরণ চিহ্নিত হয়েছে। আমি পাশ্চাত্য জীবনের এই দ্বিধাবিভক্তি ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করি, অন্ততঃপক্ষে ইসলামের দৃষ্টিতে। যদিও আমরা পাশ্চাত্যের প্রবর্তিত আইন মেনে চলি কিন্তু একটি ধর্মীয় মণ্ডলীর মানুষ হিসাবে আমি নিজেকে ধর্মের বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না। তাছাড়া আমি পৃথিবীর সকল ধর্মের মৌল বিশ্বাসকে জানবার চেষ্টা করি এবং সেগুলোর মধ্যে পবিত্রতা এবং প্রশান্তি খুঁজে পাই। আমার জীবনচর্চার এই বিশেষ দিকের কারণে আমি সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

লোকের কাছেই বন্ধু হিসাবে গৃহীত হয়েছি। আমার বিবেচনায় মৌলবাদী হচ্ছেন তিনি, যিনি অন্য ধর্মের এবং অন্য ধর্মাবলম্বীর ক্ষতিসাধন করে অথবা বিকৃতি ঘটিয়ে আপন ধর্মমতকে প্রবল বলে চিহ্নিত রাখতে চান। আমি কোন প্রকার বিচারেই মৌলবাদী নই। আমি বিশ্বাস করি যে, একজন মুসলমানকে তার ধর্ম সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। সচেতনতার জন্য কোরআন শরীফের পাঠ গ্রহণ অপরিহার্য। আমার নিজের জীবনে আমি সকল ধর্ম বিষয়ে অনুসন্ধান করেছি। ইসলামের বাইরে যে ধর্ম বিষয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা করেছি তা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম। আমার বিভিন্ন গদ্য রচনার মধ্যে এবং কবিতাতেও এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমি শৈশবে আরবী এবং ফার্সী ভাষার পরিমণ্ডলে বড় হয়ে উঠেছিলাম। আমার বাবা আরবী-ফার্সী উভয় ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। আমার মা ফার্সী ও উর্দু জানতেন। এভাবে আমার শৈশব কেটেছিল আরবী এবং ফার্সীর সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্যে। সর্বশেষ কথা হচ্ছে কোরআন শরীফ হচ্ছে আমার জীবনের পথ নির্দেশক এবং আমার সাহিত্যকর্মের প্রেরণা।

প্রশ্ন ৭। রাজনীতির অঙ্গনে না এসেও আপনি আপন বক্তব্যের জন্য বা রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে চিহ্নিত হয়ে আছেন এমন এক ভূমিকায় যাকে নমনীয়ভাবে বললেও 'বিতর্কিত' বলে মনে করেন অনেকে। আপনার এই সংশ্লিষ্টতা কি বিত্তলাভের কিংবা উচ্চ পদ অর্জনের জন্য অনিবার্যছিল? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় আমি তৎকালীন সময়ের সকল মানুষের মতই পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলাম এবং আমি মনে করতাম যে, আইরিশ সাহিত্য যেমন ইংরেজী সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের স্বত্বা খুঁজে পেয়েছিলো আমারও তেমনি হিন্দু সাহিত্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলমানদের জন্য একটি নিজস্ব সচেতন সাহিত্য ধারা নির্মাণ করতে পারব। পাকিস্তান যখন সৃষ্টি হলো তখন আমার বিশ্বাস হলো যে, পাকিস্তান একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে এবং মুসলমানদের সাহিত্য চিন্তায় দিক-নির্দেশনা দিবে। সে সময়কার একটি লেখায় আমি বলেছিলাম যে, পাকিস্তানের সংহতির জন্য প্রয়োজন হলে আমি রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করব। এই হাস্যকর উক্তিটি যখন আমি বলেছিলাম তখন আমি আমার জীবনে কোনভাবেই প্রতিষ্ঠিত নই– না লেখক হিসাবে না কর্মব্যবস্থাপনায়। সে সময় কিন্তু এই উক্তির জন্য আমি বিতর্কিত হইনি। বিস্ময়ের কথা হলেও এটা সত্য যে, আমার জীবনের এই উক্তি একটি চরম ভ্রান্ত উক্তি ছিল। আমার কর্মক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, আমার জীবনে পাকিস্তান সম্পর্কে ক্রমশঃ সংশয় জেগেছে এবং অবশেষে আমি পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান করেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে আমি কখনো অস্বীকার করিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

শিক্ষক হিসাবে আমি 'রবীন্দ্র কাব্য' পড়াতাম, পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ করেছি যা পশ্চিমবঙ্গে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার যে, আমার উক্ত রচনাটি আমি কার্যত অস্বীকার করলেও তার প্রায় ২০ বছর পর আমার কিছু সংখ্যক বন্ধু আমার সেই পুরানো লেখা উদ্ধার করে আমাকে রবীন্দ্রবিরোধী বলে চিহ্নিত করলেন এবং এখনো রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আমার কোন লেখা খুঁজে না পেয়ে আমার ঐ পুরানো অস্বীকৃত রাজনৈতিক উক্তিটি কে তারা আমাকে হত্যা করার বিরাট অস্ত্র হিসাবে মনে করেন। আমার জীবনের আরেকটি ঘটনা হলো আইয়ুবের আত্মজীবনীর বাংলা অনুবাদের সাথে আমার সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা। আইয়ুবের জীবনীর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন নুরুল মোমেন এবং মুনীর চৌধুরী এবং বাংলা একাডেমীর পরিচালক হিসাবে আমার উপর দায়িত্ব পড়েছিল গ্রন্থটির মুদ্রণ কার্য এবং প্রকাশনা পর্যবেক্ষণ করা। অথচ আমিই এই গ্রন্থের অনুবাদক এই মিথ্যে কথা বহুবার প্রচার করা হয়েছে এবং আমাকে অপদস্ত করারও চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ মজার ব্যাপার, এই আইয়ুবের সঙ্গে আমার কোন ব্যক্তিগত পরিচয়ই ছিল না। পরিচয় ছিলো শওকত ওসমানের, গোলাম মোস্তফার, মুনীর চৌধুরীর এবং নূরুল মোমেনের। অথচ আমার বন্ধুগণ যারা আইয়ুবের তাবেদারী করে জীবনে সুযোগ-সুবিধা লাভ করছেন তাদের সম্পর্কে একটি শব্দ উচ্চারণ না করে আমাকেই শুধু আহত করার চেষ্টা করেন। যাই হোক, আমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। অনেকে এই অংশগ্রহণ করাটাকেও ব্যঙ্গ করেছেন। কেউ বলেছেন আমি নাকি প্রিয় কুকুরকে কোলে করে দেশত্যাগ করেছিলাম। আবার কেউ বলেছেন আমি পূর্বকৃত পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য লোককে বিভ্রান্ত করার ইচ্ছায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। বাংলাদেশ যখন হলো তখন বাংলাদেশের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অনেকের মত আমার ডাক পড়েছিল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বহু কর্ম সম্পাদনায় আমার সাহায্য নেয়া হয়েছে। শিল্পকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার জন্য যে কমিটি গঠিত হয়েছিল সে কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম আমি। আবার বাংলা উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলা একাডেমী একত্রীকরণের জন্য যে কমিটি গঠিত হয় তারও চেয়ারম্যান ছিলাম আমি। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় আমি ব্যস্ত থাকতে পারিনি। দেশের সাংস্কৃতিক সকল কর্মকাণ্ডেই আমার প্রয়োজন পড়েছে এবং আমাকে ডাকা হয়েছে। কিন্তু আমি যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধ করার চেষ্টা করলাম এবং কিছুতেই সরকারী দলের কিছুসংখ্যক মাস্তানকে ভর্তি করলাম না তখনই আমি বিতর্কিত হয়ে গেলাম এবং আমাকে আমার চাকুরী থেকে সরিয়ে দেয়া হলো। এভাবে বিতর্কিত হওয়ায় আমার কোন গ্লানি নেই। জিয়াউর রহমানের আমলে আমি প্রথমে রাজশাহীর উপাচার্য পরে তার

www.pathagar.com

উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হই। রাজনৈতিকভাবে যে সমস্ত দল শহীদ জিয়াকে সমালোচনা করে তারাও আমাকে বিতর্কিত বলে। শিক্ষাবিদ হিসাবে আমি একজন 'টেকনোক্র্যাট' এবং সেই হিসাবেই আমি শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলাম। এর মধ্যে আমার কোন অগৌরব নেই। এরশাদের আমলে দীর্ঘ চার বছর আমার কোন কর্মক্ষেত্র ছিলো না। সে সময় কবিতা কেন্দ্রের সভাপতি হিসাবে আমরা একটি এশিয়ান কবিতা উৎসবের আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এই পরিকল্পনায় অর্থ সাহায্যের জন্য আমরা রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হই। তার ফলে আমি আবার নতুন করে বিতর্কিত হলাম এবং চিহ্নিত হলাম সরকারী কবি দলের নেতা হিসাবে। আখ্যাটি পেলাম অন্য একটি কবি গোষ্ঠীর কাছ থেকে। যারা পশ্চিমবঙ্গের প্রেরণায় এবং সমর্থনে ও ছায়ায় কবিতার মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আরম্ভ করেছিলো। এদের কাছে আমি বিতর্কিত হলাম এবং এভাবে আমি স্বততঃই বিতর্কিত। তবে আমার সৌভাগ্য এই যে, আমি এই বিতর্কের স্পর্শ থেকে আমার সাহিত্য সাধনাকে সযতনে রক্ষা করেছি। আমি বিশ্বাস করি যে, আমার বিচার হবে আমার সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে, আমার শিল্প চেতনার মাধ্যমে কিন্তু আমি কখন কি চাকুরী করেছি এবং সেই চাকুরীর সুবাদে আমি যে বিতর্কিত হয়েছি তার দ্বারা ভবিষ্যতে আমার পরিচয় চিহ্নিত হবে না। আমি এ জন্য মোটেই চিন্তা করি না। আমি বিশ্বাস করি যে, "কাল বিপুলা এবং পৃথ্বী নিরবধি" এই বিপুলা কাল এবং নিরবধি পৃথ্বীর প্রেক্ষাপটে আমার পরিচয় একদিন নিশ্চয়ই যথার্থরূপে উচ্চারিত হবে।

www.pathagar.com

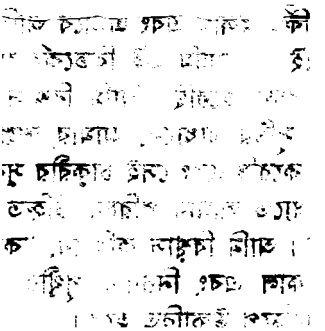

www.pathagar.com

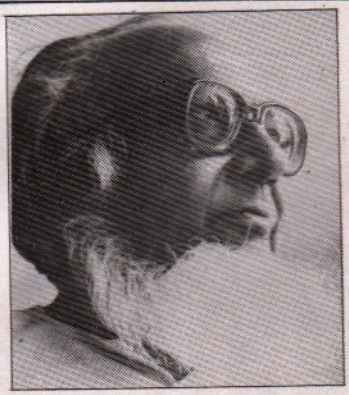

সৈয়দ আলী আহসানের বিচিত্র কর্ম-জীবন অর্ধশতাব্দীরও অধিক। এ সময়কালে তিনি অধ্যাপনা করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন হয়েছেন, উপাচার্য হয়েছেন, শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছেন। এক সময় রেডিওর একজন কর্মকর্তা ছিলেন এবং ছ'বছরেরও অধিককাল একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিচালক ছিলেন। বহির্বিশ্বে ইউনেস্কোর নানাবিধ কর্মকান্ডে তিনি জড়িত হয়েছেন এবং এক পর্যায়ে টোকিওতে ইউনেস্কোর উপদেষ্টা ছিলেন। নানাবিধ কর্মের দায়ভাগ কিন্তু তাঁকে কখনও তাঁর সাহিত্য সাধনা থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি। শুধুমাত্র সাহিত্য নয়, শিল্পকলা এবং অন্যবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও তিনি তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তাঁর বিচিত্র কর্মকান্ড তাঁকে দেশের প্রশাসনিক প্রধানদের নিকটে এনেছে। এর ফলে অনেকের দৃষ্টিতে তিনি সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। এরা নানাভাবে তাঁর চরিত্র হননের চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর মর্যাদায় আঘাত লাগে এমন সমস্ত মিথ্যা অভিযোগের কারুকর্ম তৈরী করেছেন। তিনি তাঁর কর্ম-জীবনে এ সমস্ত অভিযোগের কোনও উত্তর দেননি।

বর্তমানে পরিণত বয়েসে জীবনের একটি প্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য 'আমার সাক্ষ্য' নামক গ্রন্থে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত মিথ্যা অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন। তিনি সত্যকে সুস্পষ্টভাবে উন্মোচন করবার প্রয়াস পেয়েছেন। আমরা আশা করি এই উন্মোচনের মধ্য দিয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটবে এবং বিভিন্ন লোকের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দুর হবে।

এ গ্রন্থের প্রবন্ধ গুলো তিনি প্রথমে 'সত্যের পক্ষে' নামে প্রকাশ করেছিলেন। এখন প্রকাশ মুহূর্তে নাম পরিবর্তন করে 'আমার সাক্ষ্য' করা হল।